রঙীন স্থতো

প্রবোধকুমার সান্যাল

হিন্দুস্থান বুক ডিপো
১২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্ : কলিকাতা

রঙীন সুতো

দ্বিতীয় সংস্করণ

মার্চ্চ ১৯৪৬

প্রচ্ছদপটশিল্পী—কমল চট্টোপাধ্যায়

মূল্য দুই টাকা

হিন্দুস্থান বুক ডিপো, ১২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে সন্তোষ সেন গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস হইতে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

এপারে ছোট সহর, মাঝে নদী, নদীর ওপারে নির্জ্জন বালুচড়া। সকাল-সন্ধ্যা খেয়া নৌকা পারাপার করে। ওপারের একটি আঁকাবাঁকা পথরেখা প্রান্তরের উপর দিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত ষ্টেশনের দিকে চলে গেছে, আর কিছুদূর গেলেই ত্রিবেণীর ঘাট পাওয়া যায়।

নদীর পরপারে বালুচড়ায় আমরা পরস্পরের দেখা পেতাম। আজো পাই, আমার জীবনের রঙ্গমঞ্চে চন্দ্রার প্রবেশ ও প্রস্থান আজো চলেচে। গ্রহ-তারকার চক্রান্ত।

চন্দ্রার স্বামীও নেই, সন্তানও নেই। সে শস্যশ্যামলা নয়, একখণ্ড মরুভূমি। সে-চন্দ্রার উপর দিয়ে মেঘের মত ভেসে চলে যাই, সে আমার বর্ষণকে টেনে নেয় না। সে বিস্তৃত, অগাধ, কিন্তু রুক্ষ। তার মধ্যে কাব্য নেই, আছে ইতিহাস। কি বল চন্দ্রা, তাই নয়?

বর্ষার এই দিগন্তজোড়া ক্লান্ত সন্ধ্যার দিকে তাকালেই, বুঝলে চন্দ্রা, আমার মনের মধ্যে বেলাদিদির পদশব্দ শুনতে পাই। বেলাদিদির সঙ্গে তোমার কোথায় যেন একটি চরিত্রগত ঐক্য রয়েচে। বেলাদিদি শ্রদ্ধা করেন পুরুষত্বকে, বীরত্বকে। অত্যাচারীর প্রতি আমার করুণা, তাঁর কিন্তু আক্রোশ। যারা সাঁতার কেটে সাগর পার হয়, যারা উড়ো জাহাজ থেকে পাহাড়ের চূড়ায় লাফিয়ে পড়ে, যুদ্ধে যারা প্রাণ দেয়, যারা লাঠালাঠি করে, ট্রেণ থেকে ঝাঁপ দেয়, ফুটবল খেলে পা ভাঙে, যারা বিপ্লবী, তাদের কথায় বেলাদিদির অহেতুক আনন্দ। বেলাদিদি বড় ঘরের মেয়ে, মোটরে ছাড়া তিনি চলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ উপাধিটি তাঁর কণ্ঠলগ্ন

হয়ে ধন্য হয়েচে। তিনি সম্ভ্রান্ত সমাজের, তাঁর ভক্তের সংখ্যা অনেক।

এত শিক্ষা এত জ্ঞান তবু বেলাদিদি কেমন ধীরে ধীরে নেমে এলেন। রূপবতী মেয়েকে বুঝি, কিন্তু রূপ সম্বন্ধে যে-মেয়ে বিশেষ সচেতন, তাকেও কি সহজে বোঝা যায় চন্দ্রা? বেলাদিদিরও ‑- আগুন ছিল। বেলাদিদি একজনকে ভালবাসেন, কিন্তু সে ভালবাসা নয়। ভালবাসা যে নয় তা জানলাম এই সেদিন। বেলাদিদি আজ সব ভুলে গেচেন, কেবল ভুলতে পারেননি আগেকার ঐশ্বর্য্য-বিলাস। সেদিন দেখি একটি গলির মধ্যে একটা গ্যাসের আলোর নীচে ফিট্‌ফাট্ পরিচ্ছদে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে বেলাদিদি সিগারেট্ টান্‌চেন। চম্‌কে উঠো না চন্দ্রা, জীবনের গতি সব সময় সোজা দিকে নয়।

এ ত' সন্ধ্যার বাদল, কিন্তু ভোরের বর্ষণের দিকে তাকালেই যার কথা আমার প্রথম মনে পড়ে সে বেলাদিদি নয়, আর একজন সেও বর্ষা, আমার ক্ষেতে ফলিয়েচে সে অনেক ফসল। তার কথা বলতে গেলে আমার প্রত্যেকটি রোমকূপ পর্য্যন্ত মুখরিত হয়ে ওঠে। চন্দ্রা, তাকে নিয়ে কোনদিন গল্প লিখতে বসবো না এই আমার আনন্দ। সে আমার প্রকাশ নয়, বিকাশ। মূলধন নয়, গুপ্তধন। তার কথা ভাবলেই আমি রূপবান হয়ে উঠি। সে বোধ হয় প্রদীপ-শিখা, আমার মনের কাছাকাছি এলেই আমি আলোকিত হয়ে উঠি। সে আমার আত্মার ঘুম ভাঙিয়েচে।

গল্প লেখা চলে না

আমার জীবনে কয়েকবার জলে' উঠেছিল

নই। আমি বেশ জানি, স্বামী তার বর্ত্তমান

সান্নিধ্যকে এড়িয়ে চলে।

তবু জানি স্বামীকে পার্ব্বতী ভালবাসত এখনকার যে-কোনো সতী-লোকের মত। কারণ পার্ব্বতী দুর্ব্বল নয়, ভঙ্গুর নয়—আমার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ছিল তা স্বামী-স্ত্রীর চেয়েও গভীরতর। আমি ঝঞ্ঝা দেখেছি, দাবানল দেখেছি, ইরাবতী নদী দেখেছি, তাই পার্ব্বতীকে আমি সহজেই চিনতে পারি।

পার্ব্বতীকে দেখে পার্ব্বতীকে আঁকা যায় না। সে হয় চিত্র—চরিত্র নয়। হুবহু চরিত্র নকল করাটা শুধু প্রকাশের কৃতীত্ব, তাতে গল্পের

একটি একটি করে'

কলের প্রদীপ নিয়েই ত' আমার দীপা-

উৎসবের দিনে আমি তাকে কেমন করে' ভুলবো,

প্রাণ-মন্দিরে যেজন সন্ধ্যাদীপ দিয়ে গেচে। সন্ধ্যাদীপের

মতই সে ভীরু, ক্ষণিক, দুর্ব্বল—দেখতে দেখতে সে মিলিয়ে যায়,

সে কল্পনা নয়, মনোবিলাস নয়, সে সত্য কিন্তু স্বল্পায়ু।

ভেবেছিলাম তাকে নিয়েই গল্প লিখ্‌ব। গল্পের উপাদান তার মধ্যে প্রচুর। প্রেমের গল্প নয়, তার ব্যর্থ জীবনের ইতিবৃত্ত। যুগে যুগে যে নারীর দলের অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস আমাদের সমাজে জীর্ণতা এনেচে সেও তাদের একটি। অপমানিত হয়েচে সে অকারণে, অবহেলা ও তাচ্ছিল্য সে সহ্য করেচে তার সকল দিকের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও,

নিয়তির লাঞ্ছনা সে মাথায় পেতে নিয়েচে নিরপরাধেই—জীবন যে তার ব্যর্থ হয়ে গেল তার জন্যে সে বিধাতার বিরুদ্ধে কোনোদিন প্রতিবাদ জানায়নি।

সে মেয়েটির জীবন সুদূর-বিস্তৃত, তাকে নিয়ে গল্প লিখতে পারি, কিন্তু কলমের এত কারুণ্য কোথায় পাব? নিপীড়িত জীবনের দিকে তাকিয়ে যুগে যুগে যারা গল্প ও কবিতা সৃষ্টি করে' গেচে, রূপে রসে মমতায় রূপকে যারা অপরূপ করে' গেচে, তাদের হৃদয়ের উদার কারুণ্য আমি কোথায় পাবো? আমি চিণ্ময়ীকে নিয়ে গল্প লিখতে পারি, কিন্তু সে সাহিত্য হবে না, সে হবে ইতিহাস। ঘটনাকে ও চরিত্রকে যারা গল্পের প্রথম ভূমিকা থেকেই কারুণ্যের আবরণে ঢাকবার চেষ্টা করে, তারা এখনো সাহিত্য লিখতে শেখেনি।

চিণ্ময়ীকে নিয়ে গল্প লেখা তাই আমার পক্ষে কঠিন। বুঝলে চন্দ্রা?

আমি লিখতে পারি তার প্রমাণের অভাব নেই, কিন্তু ভাল লিখি এমন প্রমাণ অতি অল্প। ভালো লেখা মানে ভাল করে' লেখা নয়। মেয়ে সুন্দরী, প্রসাধনও তার নিপুণ, সর্ব্বাঙ্গ যৌবনের গর্ব্বে গর্ব্বিত, ষ্টাইল্‌ও ভাল,—কিন্তু তাতে কী এসে গেল? সাহিত্যে হৃদয়হীনা সুন্দরীর স্থান নেই। যদি বা থাকে, মহাকালের বিচারে তার হবে চির নির্ব্বাসন দণ্ড। বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের ঐশ্বর্য্য যে রচনায় নেই, দেবী ভারতী তার উপর দৃষ্টি করেন না। তিনি চান ফুল, সে ফুল গন্ধহীন হোক, কিন্তু কাগজের তৈরী না হয়।

কাগজের তৈরী না হয়, এই কথাই আমি চন্দ্রাকে সেদিন বল্‌তে চেয়েছিলাম। ওপারের বালির চড়ায় বসে' চন্দ্রাকে আমার সেদিনের 'মোহ, মায়া ও মতিভ্রমের' কয়েকটা কথা বল্‌তে গিয়ে প্রথমেই মনে হলো, মেয়ে-বন্ধুর কাছে হাল্‌কা প্রেমের গল্প বলার মত বিড়ম্বনা সংসারে আর কিছু নেই। প্রেমের গল্প বলেছি এইজন্যে যে, চন্দ্রা আমার বন্ধু, আর কিছু নয়। চন্দ্রা যে আমার আর কিছু নয় তা সেও জানে। জানে বলেই চন্দ্রার কাছে আমার কোনো কলঙ্ক গোপন নেই। 'কলঙ্ককে কাপড় চোপড় পরিয়ে ভদ্র-সমাজে পরিচিত করে' দিলেই তার নাম হ'ল প্রেম। প্রেমকে নিয়ে তাই সংসারে যত চোখের জল, যত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ।

শোনো চন্দ্রা :

একটি মেয়ে, ঘুরিয়ে কাপড় পরা বেশ একটি আধুনিক মেয়ে, বিয়ের বয়স হয়ে গেছে কিন্তু মাথায় সিঁদুর নেই,—বোধ হয় দেশী খৃশ্চান্‌, অর্থাৎ পাত্র জোটেনি। হঠাৎ হ'ল আলাপ হাওড়া ষ্টেশনে। মেয়েটি নিজেই আলাপ কর্‌ল, তাত' করবেই। যে-পুরুষের চোখে আর ভঙ্গীতে আসক্তির ছায়া অল্প, তার সঙ্গে যেচে আলাপ করা কোনো কোনো মেয়ের পক্ষে সহজ। আলাপ করেই জানা'লা, সে তার ছোট মাসিমাকে পুরীর গাড়ীতে তুলে' দিতে এসেছিল। মেয়েটি হাসপাতালের নার্স, নাম, একটা মিথ্যে নামই বলি,—ইন্দুমতী।

শোনো চন্দ্রা :

আলাপ হ'ল। তারপর? বাজ্যের বাজে কথা, মিথ্যা মৌখিক

ভদ্রতা, অকারণ বিনয়, অসহ্য ন্যাকামি। 'কি আশ্চর্য্য, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি, আপনি খুব ঘুরে বেড়ান্ ত? এত রাত্রে আপনি একা মেয়েছেলে হয়ে, চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে। কোন্ দিকে যাবেন?'

'না না, একাই যেতে পারব, এই ত' শিয়ালদা'র কাছে আমাদের বাড়ী। মিষ্টার দত্তকে চেনেন্? এডভোকেট—আমার দাদা হন্।'

রাত্রির অন্ধকার। অবশ্য ঘন অন্ধকার নয়, অত আলো জ্বল্‌চে চারিদিকে। তবু রাত্রির অন্ধকার বললে বুঝবে, অপরিচিত দু'টি নরনারী রাত্রির আলোয় রাস্তায় একসঙ্গে যেতে যেতে কী ভাবে! উঠলাম গাড়ীতে, চল্‌লো ছুটে। ছুটলো ভবানীপুরের দিকে। মোটরে করে' এক হোটেলে এসে দু'জনে নামলাম। প্রেম নয়, প্রেমের ভূমিকা। খেলাম দু' পেয়ালা চা। তাকে নিয়ে সময় কাটানোই তখন আমার কাজ।

ইন্দুমতী এক সময় ভ্রূকুঞ্চন করে বল্‌ল, 'আপনি কি নেশা করেছেন? দেখুন, আমার কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, বরং আর একদিন না হয়—'

হাত ধরে' তাকে আবার গাড়ীতে তুলে' নিয়ে বললাম 'ভয় কি?'

শোনো চন্দ্রা:

মোটর ছুটে চল্‌ল। মেয়েটির ভয় ছিলনা, ছিল একটা জড়িত সঙ্কোচ। আরো ছিল অসহায়তা, মানে বিপদে পড়ে' অসহায় নয়,

নিজেকে দুর্ব্বল জেনে সে অসহায়,—অর্থাৎ এই সাধারণ মেয়ের মতই আর কি।

এমন বললাম না যে আমি তাকে ভালবাসি, সেও যে তা শুনতে চায় এমন মনে হল না। তবু রাত্রির অন্ধকারে এক-পথ থেকে আর এক-পথে কেন আমাদের এই ঘোরাঘুরি, সে প্রশ্ন বিধাতা করবেন আমাদের ভিতর দিয়ে। যাক্ সে কথা। লেক্‌রোড হয়ে ঘুরে এসে গড়ের মাঠের কাছে নেমে গাড়ী ছেড়ে দিলাম। তারপর ? যাই কোথা ? মনে হলো আমরা দুজনেই নির্জ্জন, একান্ত,—আমরা কি পথ হারালাম ?

মাঠের মধ্যে চল্‌তে চল্‌তে গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক সময় ইন্দুমতীর হাত ধরলাম। চন্দ্রা, তুমি জান আমার সত্য পরিচয় কী। জনসাধারণের চক্ষুর অন্তরালে এসে ইন্দুমতী একটু স্নিগ্ধ হাসি হাস্‌ল। ইন্দুমতীর চরিত্র পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, লোকচক্ষু যখন তাকে আর দেখতে পায় না। মেয়েদের অনেকটা স্বভাবই এই। দয়িতের জন্য তাদের অশ্রুজল পড়ে নিভৃতে, পাপের কলাকৌশল তারা সন্ধান করে একান্ত নির্জ্জনে, সত্যকারের নারীত্ব তাদের উদ্বোধিত হয়ে ওঠে গোপন তপস্যায়।

ইন্দুমতী হাসল কিন্তু সে-হাসি পুরুষ-সান্নিধ্যজনিত আসক্তির নয়, মাঠের মাঝখানে তার সে-হাসি দেখে চোখে আমার ঘুম জড়িয়ে এল। চন্দ্রা, তুমি হয়ত হাসবে আমার কথা শুনে, সংস্কৃত শ্লোক্ আউড়ে তুমি হয়ত আমায় লজ্জাই দেবে। কিন্তু তুমি জানো না,

মেয়েদের আমি সম্মান না দিয়ে পারিনে। তারা দুর্ব্বল তাই তাদের আমি ভালোবাসি। মেয়েদের সম্বন্ধে আমি আইন-অমান্য করি কিন্তু টেররিজম্ করিনে।

হাত ধরে' ইন্দুমতীকে বললাম, 'তারপর ? এবার কি করবে ?'

থতিয়ে গিয়ে বল্‌ল, 'কি করব বলুন ?'

শোনো চন্দ্রা : আমি তার একটি হাত চুম্বন করলাম। চন্দ্রা, সব মেয়েই জানে আমার কাছে তারা কী নিরাপদ। সব মেয়েই জানে আমি তাদের ভালবাসায় হয়ত ঠকিয়েচি, কিন্তু ভালো ব্যবহারে ঠকাইনি ! চন্দ্রা, তুমি আমার সব জানো।

আমি যদি কল্পনা করতাম তা হলে হয়ত ভাল গল্পই তৈরী হ'ত, কিন্তু তা হবার নয়। এও জানি, সত্য ঘটনা কুশলী শিল্পীর হাতে বিকৃত হয়ে একটি সাহিত্যের রূপ পায়। কিন্তু ইন্দুমতী আমার জীবনের একটি সামান্য আকস্মিক ঘটনা। এমনিই আকস্মিক যে, আমি ভেবেই পেলামনা, সে রাত্রে তাকে নিয়ে আমি কি করি এবং কোথায় যাই ! আমার সত্য পরিচয় হচ্ছে যে, আমি ভদ্র। বন্ধুত্ব করবার সময় আমার কেবলই মনে হয়, এ বন্ধুত্ব আমি রক্ষা করব কেমন করে'।

মাঠের অন্ধকারে ইন্দুমতীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আমার কেমন যেন মায়া হলো তার ওপর। আমি একবার আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে জীবনের গভীরতম ভাষাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলাম। আমার উত্তেজনা ছিল না, ছিল ব্যাকুলতা। আমি যে চিরদিনের

পথভ্রান্ত তা আমি ভুলে' গেলাম। নিজের সম্বন্ধে সকলের চেয়ে বড় প্রশ্নটাই সর্ব্বপ্রথম আমার মনে হলো, ইন্দুমতী কি সেই নারীর দলের একজন, যাদের ভিতর দিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমি নিজেকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি ?

স্নিগ্ধকণ্ঠে ইন্দুমতী বল্‌ল, 'আপনি এমনি নেশা করে' কল্‌কাতার পথে ঘুরে বেড়ান্? কেন? এ অবস্থায় আপনি বাড়ী ফিরবেন কেমন করে ?'

চন্দ্রা, সত্যি বলছি ইন্দুমতী আমার কেউ নয়, আজো তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ গড়ে' ওঠেনি, তবু সে-রাত্রে আমার চোখে জল এসেছিল। তুমি বলবে, নেশা করলেই আমার চোখে জল আসে। হ্যাঁ, তা সত্যি, নেশা করে' নিজের চেহারা দেখে আমার কান্না পায়। কিন্তু ইন্দুমতীর আয়নায় নিজেকে দেখলাম যে। সে-মেয়েটি আমার একটি রাত্রির বন্ধু।

শোনো চন্দ্রা: আমার ঠিকানা ইন্দুমতী টুকে নিয়ে গেছে। বলে গেছে, আমার ঋণ সে জীবনে ভুলবে না, আমিই নাকি তার প্রথম পরমাত্মীয়।

তার একটি হাত ধরে' আমি খেলা করেছি, এই তার আনন্দ। সে-রাত্রে তাকে শিয়ালদা ষ্টেশনের কাছে পৌঁছে দেবার সময় সে বল্‌ল, 'অমুক দিন আসছি আপনার কাছে, সেদিন হাসপাতালে আমার ছুটি।'

এসেছিল বৈকি। সে গল্প যেমন অপূর্ব্ব তেমনি আজগুবী চন্দ্রা, তুমি শুনবে সে গল্প ?

রঙীন সুতো

গল্পটা যতক্ষণ মনে মনে থাকে ততক্ষণ সে পাকা সোণা। কিন্তু সাহিত্যের ব্যবহারে সে পাকা সোণা চলে না। সে সোণায় খাদ মিশিয়ে বাইরে আন্‌তে হবে। সাহিত্যে সেই গিনি সোনার দাম বেশী। ঔজ্জ্বল্য, মনোহারীত্ব, চাকচিক্য—এই হচ্ছে গিনি সোণার রূপ, এবং তাই হচ্ছে সাহিত্য। সত্যি নয় চন্দ্রা?

সাহিত্যে আমরা যে, জীবনের আস্বাদ পাই, তার মূলগত অনুপ্রেরণা হচ্ছে আমাদের ব্যবহারিক জীবন। এমন লেখকের অভাব আমাদের দেশে নেই, যার ব্যবহারিক জীবনের সংবাদ-সমষ্টি সাহিত্য-রাজ্য অধিকার করে' সৌন্দর্য্যময় সাহিত্য-জীবনকে ম্লান করতে উদ্যত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা যদি লক্ষ জীবনের তারে তারে প্রকাশের কৃতীত্বে অনুরণিত না হয়ে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে সাহিত্য-বিচারে তার কানা কড়িও মূল্য নেই।

সাহিত্যের এই গোড়াকার কথাটা আমার মনে হচ্ছিল যখন আমি আবার তরুবালার দেখা পেলাম। অপরাহ্ণের ক্লান্ত আলোয় চলন্ত ট্রেণের মধ্যে সহযাত্রিনী হিসাবে তাকে যখন হঠাৎ চিনলাম, তখন প্রথমেই আমার মনে হ'ল, একে আমি দীর্ঘ আট বছর ধরে' ভুলেছিলাম কেমন করে? চন্দ্রা, এ আমার গল্প বলার ভূমিকাও নয়, প্রেমের গল্পের উপক্রমণিকাও নয়। তরুবালার সঙ্গে আমার প্রেমও নেই' তাকে নিয়ে আমার গল্পও হবে না। তরুবালা হচ্ছে আমার স্পষ্ট অভিজ্ঞতা, তার কথা নিয়ে কল্পনা করে' সাহিত্য সৃষ্টি করার দৈন্য আমার নেই।

তরুবালাকে চিনলাম তার হাসির শব্দ শু'নে। তার মুখ দেখে নয়,

তার হাসির শব্দে। সামান্য কারণ ঘটলেই হাসতে হাসতে চুরমার হয়ে ভেঙে সে কাৎ হয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে সে নিজেই যন্ত্রণা পায়, হাসির পরিশ্রমে ও কষ্টে তার চোখে জল গড়িয়ে আসে। বাঙলা দেশে একটিমাত্র মেয়ে হাসতে জানে, সে তরুবালা।

অস্তমান সূর্য্যের আভায় আর একটা চিহ্ন, দেখে তাকে চিনলাম। তার চোখ কালো নয়,—কালো যে নয় এইটুকুই আমার মনে আছে। কিশোর কালে আমরা দু'জন গলা ধরাধরি করে' যখন উচ্চস্বরে ডি-এল-রায়ের গান গাইতাম, তখন এক একবার কি মনে করে' তার চোখের দিকে অবাক হয়ে চাইতাম,—তখন থেকেই আবার মনে আছে তরুবালার চোখ কালো নয়। আমি শরৎকালের নীলোজ্জ্বল আকাশকে গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেচি, শেষ-বসন্তের বনশ্রেণীর মধ্যে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে' গেচি, তাই দেখে আমার মনে হয়েচে তরুবালার চোখ কালো নয়।

পরস্ত্রীর দিকে তাকাবার যে অস্বাভাবিক কুণ্ঠা তা আমি আজো হারাইনি। হারানোই যে ভালো এ আমি বিশ্বাস করি। যে-কোনো নারীর দিকে সরল দৃষ্টিতে তাকানো সুস্থেরই লক্ষণ। পরের সম্পত্তি বলে' পরস্ত্রীর প্রতি যারা তাকায় না, তারা নারীকে অপমান করে। নারীর প্রতি গোপন প্রলোভন যার আজো মরেনি, পরস্ত্রীর দিকে তাকানো তাদেরই কাছে দুর্নীতি।

তরুবালার দিকে তাকালে দেখতে পেতাম, সমস্ত গাড়ীর যাত্রীরা তার অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের অত্যাচারে কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেচে।

চঞ্চল হবার মত তার দেহ বটে। শক্ত বেতের চাবুক যেমন সপাসপ করে' আস্ফালন করে, তরুবালার দেহটি তেমনি। পাতলা ইস্পাতের মত তার দেহ। সুন্দর ও মনোহর একটি সাপের মত তার দেহখানি এঁকে বেঁকে হিল্ হিল্ করচে। সে দেহ রক্ত-মাংসের না হয়ে যদি মাটির তৈরী হ'ত তাহলে বলতাম, সে সরস্বতী। তরুবালা নয়, সরস্বতী!

ট্রেণ থেমেচে। চা খেতে নামলাম। মুখ বাড়িয়ে সরস্বতী বল্‌ল, চা'অলাকে একবার ডেকে দেবেন—ওই যে ওদিকে—

এক পাও নড়লাম না, কেবল তার মুখের দিকে তাকালাম।

আরে। তুমি?

হাঁসলাম না। শুধু বললাম, চিনেচ?

এতদিন পরে নাটকীয় ঘটনার মত দেখা পেয়ে তরুবালা বোধ হয় উচ্চকণ্ঠে হাসবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে অবাক হয়ে চুপ করে রইল। হঠাৎ সন্দেহ হ'ল সে যেন ফুরিয়ে গেচে!

স্বামী ছিলেন সঙ্গেই, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাধিত হলাম। তরুবালার পাশে রয়েচে তারই একটি মেয়ে—বছর পাঁচেক বয়স। সরস্বতীর মেয়ে!

এর পর আর গল্প নেই। আট বছরের ব্যবধান, সে ব্যবধান জোড়া লাগে না। তা ছাড়া জোড়া লাগবেই বা কেন? আমার জীবনের সঙ্গে যতদিন তরুবালা জড়িয়ে ছিল, তার সঙ্গে আমার আলাপের অস্তিত্বও ছিল ততদিন! এমনিই ত' হয়!

জীবনকে বদ্ধ জলার মত করে' রেখে লাভ নেই। যে-নদীতে নেই স্রোত যার নেই জোয়ার-ভাঁটা, সে-নদী মরেচে, তার অস্তিত্ব অস্বাস্থ্যকর। তরুবালা আমারই স্রোতে ভেসে ভেসে গিয়ে বিস্মরণের মহাসমুদ্রে মিশেচে, আট বছরের ব্যবধান পার হয়ে গিয়ে তাকে নিয়ে প্রেমের গল্প লেখার মত ধৈর্য্য ও রুচি আমার নেই।

—আচ্ছা, কি দৌরাত্মিটাই আমরা করতাম' নয়?

একবার মনে হ'লে হেসে তার এ কথাটার জবাব দিই, কিন্তু তরুবালার মুখ থেকে এই সুলভ মৌখিক আলাপ শুনে আমার গা ঘুলিয়ে উঠল। দু'জনেই আমরা দু'জনের মুখের দিকে তাকারো, কিন্তু কী দেখব? দেখব আমরা নিজেরাই নিজেদের চিন্তে পারচিনে, দুজনের মুখেরই পরিবর্ত্তন ঘটেচে। এই আট বছরের জীবনের বিচিত্র ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা আমাদের মুখে ছাপ ফেলে ফেলে পার হয়ে গেচে। আমাদের সে মন গেচে হারিয়ে, সে-হৃদয় গেচে তলিয়ে, সে-পরিচয় গেচে অতীতের অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে। আজ তরুবালা যে পরস্ত্রী তা'তে আর সন্দেহ নেই।

উচ্ছ্বাসের দিকে দ্রুত ছুটে চলেচি তা ভুলিনি। আমার সব চেয়ে বড় উচ্চাশা, আমার সাহিত্যে উচ্ছ্বাস স্থান পাবে না। আমি যদি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে চাই তরুবালাকে একদিন সত্যই ভালো বেসেছিলাম, তা হলে তার চেয়ে বড় কলঙ্ক আর আমার কিছুই নেই। যে-ভালোবাসার মধ্যে শুধু হৃদয়াবেগ,—মস্তিষ্ক-বিচার নেই সে-প্রেম অন্ধ,—সে প্রেম নিয়ে উন্মাদ হওয়া যায়, কিন্তু সহজ হওয়া

যায় না। তরুবালার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতম পরিচয় হয়ত ছিল, কিন্তু ভালোবাসা ছিল না।

তুমি এত বড় হয়ে গেচ?—তরুবালা বল্‌ল, তখন খুব ছোট ছিলে, এম্‌নি রোগা! আমাকে চিন্‌তে পেরে ডাকোনি কেন? তোমার দিদি কোথায়? এখন কোথায় থাকো?

এই প্রশ্নগুলির মধ্যে অনাত্মীয়তার যে কী গভীর ইঙ্গিত তা আমি জানি। তরুবালা কথা বলচে, দূর থেকে মাঝখানে আট বছরের পথ সে পার হয়ে আসবার চেষ্টা করচে, তার কণ্ঠস্বর তাই আমি আর শুনতে পাই না।

জীবনের সব চেয়ে বড় কলঙ্ক বাল্য-প্রেম। তার কারণ তা প্রেম নয়। তরুবালার দেখা পেয়ে মনে হলো, আমার মিথ্যাবাদী মন তাকে নিয়ে অন্ধের মত শুধু ইন্দ্রজাল রচনা করেছিল, ভালবাসেনি। বাল্যকালের বন্ধুত্বকে 'বাল্য-প্রেম' নাম দিয়ে সাহিত্য লেখা খুব সহজ, তার কারণ তার মধ্যে কল্পনার অবকাশ আছে—কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে সে বাল্যপ্রেমের কোন মূল্য নেই। বড় বড় আর্টিষ্ট্‌রা বড় বড় মিথ্যাবাদী। জগতে কবি ও গল্প লেখকেরা মানুষকে আজ পর্য্যন্ত যত ভুল পথে চালনা করেচে এমন আর কেউ নয়। তরুবালাকে নিয়ে যদি আমি মিথ্যাভাষণ করতে সুরু করি তা হলে আমার গল্প সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য ব'লে গণ্য হতে পারে, কিন্তু তা আমি পারবো না—পরনারী অথবা ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে' বাংলা দেশে যে-শ্রেণীর সৎসাহিত্য গড়ে উঠেছে, সেখানে আমার ঠাই নেই!

শোনো তারপর,—আগে ইন্দ্রানীর কথাটা ব'লে নিই তার সাজ-সজ্জাটার বর্ণনা কিছু শোনালে যেন বিরক্ত হয়ে উঠো না—

ইন্দ্রাণীর কানের ঝুমকো দুটোয় মুক্তো বসানো। হাতে কয়েকগাছি চুড়ি—সোনার সঙ্গে কয়েকগাছি লাল-সবুজ মিহি বেলোয়ারি, হাত দুখানা নাড়লে ওস্তাদ সেতারির যন্ত্রে ও'ঠে যেন মৃদু-মৃদু ঝংকার। ইন্দ্রাণীর পরনে আজকে ছিল রেশমী নীলাম্বরী, তা'তে চওড়া শাদা জরির পাড়। কাঁধকাটা জামা, অনাবৃত বাহু দুখানা শাখের মতো শুভ্র। স্বাস্থ্যের জৌলস এখনো রয়েছে। আমি তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলুম।

আমার দিকে একবারটি মুখ ফিরিয়ে সে বসলো। তারপর সম্মুখে লাইফ-সাইজ আয়নায় প্রতিফলিত আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে মনে পড়লো? ভাবলুম চারিদিকে যে রকম হুজুক, তুমিও বুঝি তলিয়ে গেছ। দুর্ভিক্ষের চাঁদা আদায় করতে এলে নাকি?

মাথার এলোখোঁপায় আইভরি কাঁটা গুঁজে ইন্দ্রাণী তার বিগত যৌবন মুখের রেখাকুঞ্চনের ওপর পাউডারের পাফ বুলোতে লাগলো।

বললাম, বিশ্বাস করো, নিস্বার্থভাবেই এসেছি।

সবিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠে ইন্দ্রাণী বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠলো। বললে পুরুষ মানুষ সত্যবাদী হ'লে ভয় করে। ডান হাতে সুইচ টিপে আলোটা সে জ্বাললো।

বললাম, বুড়ো বয়সে এত সাজসজ্জা কেন? কোথাও যাচ্ছ নাকি?

রঙীন সুতো

শরতের সন্ধ্যা আমার ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে জমে' উঠেচে। আলো নেই, হাওয়া নেই—চাপা নিশ্বাসরোধী অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে তরুবালার ছায়ার দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ তার কথা ভাবচিলাম। সেদিন ট্রেণের মধ্যে তরুবালা যদি সাশ্রুনেত্রে পুরাতন প্রেম নূতন করে' নিবেদন করত তা হলে বিরক্ত হতাম কিনা সেই কথাই ভাবচি।

তবু জানি তরুবালা একদিন ছিল আমার সর্ব্বনাশিনী অগ্নিশিখা। সে-শিখা আমাকে আলোকিত করেনি, বার বার পুড়িয়ে মেরেছে। আমি ছিলাম অসহায়, দুর্ব্বল, ভীরু,—অঙ্গুলি হেলনে তরুবালা তখন আমাকে দিয়ে সংসারের যে কোনো অন্যায় এবং যে কোনো পুণ্যকার্য্য করিয়ে নিতে পারত। আমরা ছিলাম সমবয়সী। তরুবালা ছিল আমার চেয়ে সবল ও সুস্থ। সে স্ত্রীলোক, এই সুবিধা নিয়ে সে আমার পরে যত অত্যাচার করেচে, এমন আমার নিয়তিও নয়। লোহার চিম্‌টে পুড়িয়ে আমার গায়ে সে হেসে হেসে কতবার ছেঁকা দিয়েচে তা আমি আজো মনে করতে পারি, গায়ের ওপর ছুঁচ বিঁধে রেখে কতবার সে ছুটে পালিয়েছে, ঘ'র ঢুকলে শিকল তুলে' দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছিল তার রীতি। তরুবালাকে আমি ভয় করতাম।

তরুবালাকে নিয়ে মুখের গল্প হয় কিন্তু সাহিত্যের গল্প হয় না। তরুবালার কল্পনায় ঔজ্জ্বল্য মনোহারীত্ব এসব কিছু নেই। সে নিতান্ত সুন্দরী, অত্যন্ত চলনসই সুন্দরী। তরুবালাকে

মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আমি অনেকগুলো গল্প লিখেছি, কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে গেলে আমার কলম চলে না।

একটি মাত্র মেয়েকে আমি ভালবাসি, কিন্তু সে তরুবালা নয়। আমার কালো দীঘির তীরে তীরে যারা ছায়া ফেলে সরে' গেচে তরুবালা মাত্র তাদেরই একজন। আমার আকাশ থেকে তরুবালা কক্ষচ্যুত হয়ে গেচে।

ট্রেন থেকে নামবার সময় চুপি চুপি সে বলে' গেচে, 'অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেল, দুপুর বেলা একদিন যেও আমাদের ওখানে—রবিবার ছাড়া যে কোনো দিন—'

আজও ভাবচি চন্দ্রা, তার কাছে একবার যাবো কি না।

চন্দ্রা, শোনো বলি তারপর—

কাশীতে গণেশ-মহল্লার গলি জানো ত'? নিশ্চয়ই জানো। সেই গলির গোলকধাঁধাঁয় অনেক ঘোরাঘুরির পর আমার প্রিয় দুশ্চরিত্র বন্ধু শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন এক দরজার কাছে এসে অন্ধকারে অত্যন্ত মৃদু হাতে কড়া নাড়লেন। ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট, ধীরে ধীরে কপাট খু'লে গেল।

'এই যে ইনি, এঁর কথাই তোমাকে বলছিলাম সরোজ, আমার প্রিয় বন্ধু। আচ্ছা—আমি এখন যাই।'

সামান্য পরিচয় করিয়ে দিয়েই বন্ধু বিদায় নিলেন। চন্দ্রা, এ গল্প শুধু তোমার জন্যে, সাহিত্যের জন্যে নয়। ব্যক্তিগত জীবনের কলঙ্কের

কথা যারা সুললিত ভাষায় সাহিত্যে প্রচার করে তাদের দলে আমি নেই। জীবনের ক্ষেত্রে যে-তৃষ্ণা আমার মেটেনি, যে-আশা আমার সুদূরপরাহত, যে-গোপন কামনা আমার প্রকাশের পথ পায়নি— সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তাদের সে-দাবী মিটোতে আমি ঘৃণা করি। মানুষের চরিত্র আঁকতে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টির চেয়ে কল্পনার খেলা যারা দেখায় তারা শক্তিশালী লেখক হতে পারে কিন্তু শিল্পী নয়। অধ্যয়নের পাণ্ডিত্য নিয়ে যারা গল্প লিখতে আসে তারা যশ পায় সন্দেহ নেই, কিন্তু তা অপযশ।

পরিচয় যার সঙ্গে হলো, সে নারী। হেসে অভ্যর্থনা করে' ঘরের ভিতরে তুলে' নিল। যেন কত দিনের আলাপ। দরজাটা আবার সে বন্ধ করে দিল। চন্দ্রা, আমার কি মনে হলো জানো? সে যেন আমায় কারাগারের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বন্দী করল। আমার পালাবার আর পথ নেই।

যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে আমি অনর্গল কথা বলে যেতে পারি, যদি সকল দরজা খোলা থাকে। দরজা বন্ধ করলেই আমার মনের চেহারা বদলে যায়। বাইরের হাওয়া বন্ধ হলেই আমার মধ্যে একটা নতুন ঝড় ওঠে। তার জন্য আমি লজ্জিত। তুমি জানো চন্দ্রা, আমার সে ঝড়ের চেহারা কেমন। দূর আকাশের পার হয়ে ওঠে রাঙা, সমুদ্রের জল ওঠে ফুলে, গাছ পালা শত হাতে মাথার চুল ছিঁড়ে ছট্‌ফট্‌

করতে থাকে, প্রলয়ের বল্‌গা খুলে দিয়ে বিদ্যুতের চাবুক আকাশকে জর্জ্জরিত ক'রে তোলে।

শোনো চন্দ্রা, মেয়েটির নাম সরোজ। এই ধরো আঠারো উনিশের কোঠায়। চেহারা সুশ্রী নয়। বয়সের একটা রূপ আছে সেই রূপটাই সরোজের পাথেয়। দশ বছর পরে তাকে নির্ভয়ে কুৎসিৎ বলা চলবে। মেয়েদের সব চেয়ে বড় বিপদ যখন কেউ তাদের কুৎসিৎ বলে। মেয়েদের বিশ্বাস, রূপ ছাড়া পৃথিবীতে বাঁচবার আর তাদের দ্বিতীয় সম্বল নেই।

সরোজ আমার একটি হাত ধরে মেঝের উপর ছড়ানো বিছানার ধারে বসালো, তারপর হাতপাখাখানি নিয়ে ধীরে ধীরে আমার গায়ের উপর বাতাস করতে সুরু করল। যে কোনো জাতের মেয়েই হোক, পুরুষকে দেখলেই সে তাকে অকুণ্ঠ সেবার দ্বারা অকারণে খুসী করবার চেষ্টা করে। ঘরের ভিতরে একবার তাকালাম। মাটির প্রদীপ জ্বল্‌চে। একপাশে রাত্রের খাবার ঢাকা। একটি ছোট তোরঙ্গ। কয়েকটি বাসন। এক জায়গায় পান সাজবার সরঞ্জাম। একটি জলের কলসী। কড়িকাঠ থেকে একটা দড়িতে বাঁধা রঙচঙে একটা তিজেল-হাঁড়ি ঝুল্‌চে। দেয়ালে কয়েকখানি ঠাকুর-দেবতার ছবি টাঙানো, স্বামী বিবেকানন্দের ছাপা ছবিখানি প্রথমেই নজরে পড়চে।

বললাম, এই তোমার ঘর?

সরোজ হেসে আমার একটি হাত তার হাতের মধ্যে টেনে নিল। বলল, কোন রকমে এইখানেই থাকি।

চন্দ্রা, আমি তোমাকে পতিতা নারীর গল্প বলতে বসিনি। পতিতা নারীকে নিয়ে যারা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করে তারা হয় বাতুল, নয়ত পতিতালয়ের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্য তারা লালায়িত। ভাষার লালিত্যে পতিতা নারীর চরিত্র অঙ্কন করতে আমি ঘৃণা করি। তার কারণ, পতিতার চরিত্র ব'লে কোনো পদার্থ ই নেই।

নিস্তব্ধ রাত। দূরে কোন্ মন্দিরে আরতির ঘণ্টা স্তিমিত হয়ে এল। চন্দ্রা, ভয়ে ও অসহায়তায় আমার সর্ব্বশরীর জমাট হয়ে আসছিল। কম্পিত কণ্ঠে বললাম, তোমাদের দেশ কোথায়?

সরোজ বলল, যেখানে থাকি।

এমনি করে তোমার দিন চলে?

না, এ কাজ ত আমি করিনে। আমি আগে মোজা বুনতাম। আমি আর মা।

মা তোমার কোথায়?

বানবাদে, মামাদের ওখানে। আমিও ছিলাম সেখানে, ভগ্নিপতির সঙ্গে এখানে এসেচি।

কোথায় তিনি? ভগ্নিও আছেন এখানে?

দিদি মারা গেছেন অনেক দিন।

ও, আর ভগ্নিপতি ?

এই কাশীতেই আছেন বোধ হয়। আমাকে এখানে রেখে …তাঁকে আর খুঁজে পাচ্ছিনে। তারপর মীরঘাটে আপনার বন্ধু আমায় দেখতে পান্…তারপর এই ত' আপনি এলেন।

চমৎকার গল্প চন্দ্রা। ভাল গল্প লেখার ভূমিকা এর চেয়ে আর কী ভালো হতে পারে। সরোজের জীবনের কারুণ্যটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারলেই চমৎকার উপন্যাস হলো। খানিকটা মহত্ত্ব, খানিকটা সংযম, কিছু পরিমাণে তেজস্বিতা ও প্রেমালাপের ছলা-কৌশল, বাস্, সরোজিনী দেবী গল্পের নায়িকা হয়ে গেলেন। আমার মত যুবক তাকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করবে, বিবাহ করতে সাহস করবে না, কারণ সে কাপুরুষ, দিনের পর দিন ধরে প্রেমের অভিনয় করবে, —তারপর গল্প-লেখকটি যদি পুরুষ হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত 'গোবিন্দলাল' সেজে 'রোহিণী'-সরোজিনীকে গুলী করে মারবে, আর যদি মহিলা-গল্পলেখক হয় তাহলে অনন্যোপায় হয়ে সরোজিনীকে রুগ্ন করে মৃত্যু এনে দিয়ে চিতায় তুলে দেবে। নায়কের হবে আবার বিবাহ। শুধু সরোজিনীর স্মৃতি মাঝে মাঝে তাকে অন্যমনস্ক করবে। বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি বলতে শুধু এইটুকু বোঝায়।

লালসার তাড়নায় যে-নারী পথে নেমে এসেছে চন্দ্রা, তার প'রে আমার কোনো মমতা নেই। মমতা নেই বলেই তাদের নিয়ে গল্প লিখতে আমি ঘৃণা করি। সহানুভূতি ও মমতার রসে মধুর ও

মনোহর করে যারা পতিতা নারীকে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস করে তারা যে জাতির শত্রু তাতে আর সন্দেহ নেই। চরিত্রহীন নারী ও পুরুষকে নিয়ে গল্প লেখার ফ্যাসান্ আমার কাছে কটু ও বিসদৃশ।

তারপর শোনো, চন্দ্রা।

সরোজ আমার গায়ে হেলান্ দিয়ে কাৎ হয়ে বস্‌ল। অর্থাৎ তাব সঙ্গে আমার পবিচয় যে নিগূঢ় তা সে ধরেই নিল। আমাকে সে যেন চিনে নিয়েচে। মেয়েরা কথায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করে না, প্রকাশ করে ভঙ্গীতে, কটাক্ষে, হাসিতে, সর্ব্বাঙ্গের নানা ইঙ্গিতে। তবু আমি জানি, সরোজ পতিতা নয়, দেহপণ্য করা তার পেশা নয়—অঙ্গ প্রসাধনে নিতান্তই সে অপটু। অত্যন্ত সাদাসিদে মেয়ে সে। সে আমার কাছে বস্‌ল আমার স্ত্রীব মত, প্রণয়িনীর মত—পতিতার কোন অশোভন অভদ্র বিহ্বলতায় আমার গায়ের ওপব সে হেলান্ দিয়ে বসেনি। তাকে আমি ভালো না বাসতে পারি কিন্তু ঘৃণা করবার পথ সে রাখল না। কানের কাছে মুখ বেখে সে আমাকে সবিনয়ে জানা'লা, এ কাজ তাকে কিছুদিন করতেই হবে, এতে নাকি অর্থ পাওয়া যায়, যদি পাওয়া যায় তাহলে কিছু জমিয়ে নিয়ে সে মায়ের কাছে চলে যাবে। মায়ের সে এখন একটিমাত্র মেয়ে।

মায়ের একটি মাত্র মেয়ে—এই কথা বলতে গিয়ে তার চোখে জল এল, চন্দ্রা। আমার কাঁধেব ওপর মাথা রেখে জানালো তার

বিপদের কথা। সে বললে, তুমি আমাকে বাঁচাও। তোমার বন্ধুটির হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

চন্দ্রা, এই পর্যন্ত আমার গল্প। আমার উদারতা দেখাবার এমন সুবিধা আমি আর জীবনে পাইনি। একটি নারী সর্ব্বান্তঃকরণে আমার কাছে মহত্তর জীবন ভিক্ষা করছে, এত বড় গৌরবকে আমি অবহেলায় ত্যাগ করব কেমন করে?

আলো নিবে গেল। ঘর অন্ধকার। একেবারে বুকচাপা অন্ধকার। চোখ বুজে আমার মনে হল, সরোজ আমাকে উধাও হয়ে উড়ে চলেচে। বিস্তৃত পরিব্যাপ্ত আকাশ, নীল দিগন্তবিলীন মহাসাগর, শূন্য মহাব্যোমপথে উড়ে যেতে যেতে সে আমায় বলচে, চল, চল আমার সঙ্গে ···· তোমার বন্ধুটির হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

চন্দ্রা, তুমি জানো আমার কত বড় পরীক্ষা। সাপের মত সরোজ যখন আমার সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করল, তখন মেয়েদের সম্বন্ধে যা আমার মনে হলো, সে কথা এখন থাক্—নদীর ধারে এই বালির চড়ায় বসে তোমার কাছে আর সে কথা উচ্চারণ করিতে চাইনে।

গল্পের শেষকে রসমধুর করে তোলবার গোপন লোলুপতা আমার নেই। আমার অভিরুচি এবং বিচারের অপেক্ষা গল্পের মধ্যে থাকবে না, যদি থাকে ত সে গল্প কৃত্রিম। গল্প তারাই লেখে মানব চরিত্রের সঙ্গে যাদের পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ। সরোজের এই আলিঙ্গনের যারা কদর্থ করবে, তাদের সঙ্গে আমার কারবার নয়, ত্রণর পাশে

মক্ষিকার মত তারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে আলিঙ্গনের মধ্যে গভীর আত্মীয়তাকে আমি কেমন করে অস্বীকার করব, চন্দ্রা? সে যে আমারই অপেক্ষা করে ছিল। ছিল বলেইত আমাকে চঞ্চল করেনি, উত্তেজিত করেনি, মাতাল করেনি। তার মধ্যে আমি আমার প্রিয়ার স্পর্শ গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।

চন্দ্রা, তুমি জানো আমার প্রিয়া কে? কাকে আমি জীবন উৎসর্গ করেছি? কে আমার নিভৃত রাত্রির সঙ্গীহীন তারকা। একটি মুহূর্ত্ত শুধু সরোজ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল আমার সৌন্দর্য্য-সম্রাজ্ঞীকে। সরোজের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

হাত ছাড়িয়ে দিয়ে পথে নেমে এসে বললাম, আর এক দিন আসতে পারি।

অন্ধকারে সরোজ বোধ হয় তখন মাথা হেঁট করে বসেছিল। সম্ভবতঃ লজ্জায় ও অপমানে। মেয়েরা কখন লজ্জিত ও অপমানিত হয় তুমি নিশ্চয়ই জানো চন্দ্রা।

জীবনের গভীরতম ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের গোপন রসপ্রেরণার মিলন যেখানে ঘটল না সেখানে গল্পটা হচ্ছে শুধু সংবাদ-সংগ্রহ। সেখানে শুধু কথাই আছে, সাহিত্য নেই বুঝলে চন্দ্রা?

কথাই আছে, সাহিত্য নেই—এমনি একটি নাটক সেদিন চলন্ত ট্রেণের মধ্যে অভিনীত হ'ল। নাটক—কিন্তু গল্পও বটে। অথচ এ গল্পের আরম্ভ যাই হোক না কেন, শেষ নেই। গল্পের নায়ক আছে,

নায়িকা আছে, দুটি পার্শ্ব চরিত্রও আছে। আর আছে, একজন দ্রষ্টা—সে আমি। তুমি গল্প শুনলে হয়ত হাসবে চন্দ্রা।

হাওড়া থেকেই ট্রেণে চড়েছিলাম তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সবাই একেবারে ঠাসাঠাসি করেচে। যতগুলি লোক জায়গা পেয়েচে, তার চেয়ে বেশি লোক পায়নি। বিড়ির ধোঁয়ায়, কলহে, কোলাহলে, মোট ঘাটের চাপে—একেবারে নিশ্বাস রোধ হবার উপক্রম।

এমনি দুর্য্যোগের মধ্যে এল বর্দ্ধমান। গাড়ী থামতেই একটি সুশ্রী যুবক ভিড় ঠেলে, ধাক্কা দিয়ে নিতান্ত গায়ের জোরে গাড়ীতে চড়াও হয়ে উঠ্‌ল। জিনিসপত্র তার সঙ্গে ছিল সামান্য। জামার আস্তিন গুটানো। ইনিই নায়ক। নায়ককে অতি কষ্টে জায়গা দিলেন একটি বাঙালী বৃদ্ধ। বৃদ্ধের পাশে ছিল একটি ছোট্ট মেয়ে। মেয়ের পাশে মেয়ের মা। সম্ভবতঃ তিনি বৃদ্ধের কন্যা এবং এই মহিলাটিই আমাদের নায়িকা। পরণে একখানি সরু কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে একখানি চাদর। মাথায় কতকগুলি চুল ঘোমটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেচে। মুখখানি করুণ, কুণ্ঠিত ও সুন্দর।

নায়কটির সঙ্গে বৃদ্ধের অতি সহজেই আলাপ হ'ল। বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তার মানে এ নয় যে নায়কটি নায়িকার সঙ্গে আলাপ করতে ব্যস্ত—অন্ততঃ দেখে তা মনে হ'ল না। দেখে শুধু এই কথাই মনে হ'ল ছেলেটি কোন নারীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। চোখে তার

দূর পথের আভাস, মুখে তার পথ ভ্রমনের আনন্দ। অস্থির এবং চঞ্চল তার অঙ্গভঙ্গী। সে বস্‌ল বটে কিন্তু সে থেমে নেই, সে ছুটচে, রাত্রিব ট্রেণের সাথে সাথে সেও পার হয়ে চলেচে পথ-প্রান্তর। থামলে তার চল্‌বে না।

এমন অশান্ত, তবু বৃদ্ধ তার সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন। ট্রেণের কথা, দেশ বিদেশের কথা, চাকরী-বাকরীর কথা। শেষের কথা হ'ল ব্যক্তিগত। পাশের তরুণীটির ঘোমটা নামিয়ে জান্‌লার দিকে তাকিয়ে সব শুন্‌ছিল। হয়ত শুন্‌ছিলই না, দেহখানি ছেড়ে মনটি হয়ত তার গাড়ী ছেড়ে বাইরে প্রান্তরের অন্ধকারে উধাও হয়ে গিয়াছিল।

'আপনি কতদূর যাবেন?'

বৃদ্ধ বললেন, 'কাশী, আমার স্ত্রী আছেন সেখানে।'

'উনি আপনার মেয়ে বুঝি? এটি নাৎনি?

নিশ্বাস ফে'ল বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, এটি নাৎনি, এর নাম দুলালী, ওইটি আমার মেয়ে, জামাইটি হঠাৎ মারা গেল, ইঞ্জিনীয়ার ছিল— যাই হোক, বলি চল্ কাশী নিয়ে যাই। অবস্থা ত ভাল নয়, একাত্তরটি টাকা পেন্‌সন পাই বাবা।'

এম্‌নি সময় দুলালী উঠে এসে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়াল। কচি দু'টি চোখ, ছোট্ট একখানি সুন্দর মুখ। বল্‌ল 'ওকে দাদামশাই?'

"ও মামা।'

দুলালী। কিয়ৎক্ষণ অবাক হয়ে আবার দু'জনের আলাপ শুন্‌তে

লাগ্‌ল। কিন্তু সে অল্পক্ষণই, তারপর ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে তার ছোট একটি হাত বাড়িয়ে যুবকটির হাতের আঙুলগুলি স্পর্শ করল। স্পর্শ করেই সে বুঝলে, এই নিতান্ত নিস্পৃহ ব্যক্তিটি সত্যই তার আত্মীয় কি না!

নায়ক তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে গভীর স্নেহে তাকে কোলে তুলে নিল।

এমন নয় যে এ গল্প ঘন হয়ে আসচে। বৃদ্ধ পিতা, হয়ত অবিবাহিত যুবক, তরুণী বিধবা এবং উভয়ের প্রণয়ের সেতুর মত এই বালিকাটি—এই অতি সাধারণ অতি-ব্যবহৃত দেশ-কাল-পাত্র নিয়ে গল্প বলার দৈন্য আমার নেই। ট্রেণের মধ্যে প্রণয়-অভিনয়ে একটি দুর্ব্বল দেহ-লালসার ইঙ্গিত আমি পাই! প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম, এবং প্রথম আলাপেই হৃদয়োচ্ছ্বাস—এর চেয়ে মিথ্যা, ভঙ্গুরতা সংসারে আর কিছু নেই! কি বল?

আসানসোল-এ এসে গাড়ী থাম্‌ল। চারিদিকের গোলমালে কাণ পাতা যায় না। বিনা টিকিটের যাত্রী যারা তাদের অভ্যর্থনার জন্য গাড়ীতে উঠ্‌ল টিকিট-চেকার। মানুষের টিকিটও লাগে, পোটলা-পুঁট্‌লিরও লাগে। একজন দেশী সাহেব বৃদ্ধের কাছে এসে টিকিট দেখ্‌তে চাইল।

টিকিট দেখানো হ'ল কিন্তু সে লোকটা দুলালীর টিকিটও দাবী ক'রে বস্‌ল।

এইবার গল্পের নায়কের জেগে ওঠবার পালা। যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে উত্তপ্ত হয়ে বল্‌ল, 'ওইটুকু মেয়ে, ওর আবার টিকিট কি?'

'হাফ্‌ টিকিট চাই, সাত বছরের মেয়ে!'

'কে বল্‌লে সাত বছরের মেয়ে? ওর বয়েস পাঁচ বছর।'

বাক্‌যুদ্ধ সুরু হ'ল, তারপর হল' কলহ, তারপর যুবকটি তাকে ঠেলে দিয়ে চীৎকার করে' বল্‌ল, বেরিয়ে যাও গাড়ী থেকে।'

টিকিট চেকার আস্ফালন করে' বলল, 'তোমাকে পুলিশে দেবো।'

যুবকটি আর সহ্য করতে পারল না, গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে গাড়ী থেকে ছিটুকে বাইরে ফেলে দিল।

এইবার নাটকের অভিনয়। সদল বলে একটু পরে শত্রুপক্ষ এসে হাজির। কোন্‌ বাবু ট্রেণের শান্তি ভঙ্গ করেছে?

যুবকটি কাছে এগিয়ে এল। একটি বয়স্ক প্রবীণ ইন্‌স্পেক্টর বললেন, 'কই দেখি কত বড় মেয়ে?'—তিনি বৃদ্ধের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভয়ত্রস্ত তরুণীটি হতচকিত হয়ে সকলের দিকে তাকাতে লাগল।

ইন্‌স্পেক্টর বললেন, 'ক' বছরের মেয়ে বলচেন?'

নায়ক বল্‌ল, 'পাঁচ বছরের, একটু বাড়ন্ত গড়ন, তাই—'

ইন্‌স্পেক্টর হাসলেন, হেসে বললেন, 'আপনি ওর বাবা হয়ে যখন বললেন পাঁচ বছর বয়েস তখন,—যাক্‌ গে, ওর টিকিট আর লাগবে না, চল হে!'—সদলবলে তিনি গাড়ী থেকে আবার নেমে গেলেন।

এক মুহূর্ত্তে সবাই যেন পাথর হয়ে গেল! যুবকটি নিশ্চল হয়ে

দাঁড়াল, বৃদ্ধ নির্ব্বাক, দুলালী চারিদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকাচ্ছে, তরুণীটির মুখ বিবর্ণ,—অতি কষ্টে শুধু সে মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে দিল।

গাড়ী আবার চল্‌তে লাগল। রাত্রি এল গভীর হয়ে। গাড়ীর কোলাহল গেল থেমে। যাত্রীদের চোখে এসেচে মন্থর নিদ্রার আবেশ।

সে যে পিতা নয়, এ প্রতিবাদ কেউ করল না। নায়কটি অন্য এক যাত্রীর পুঁট্‌লির ওপর বসে' পড়ল। তার আর চাঞ্চল্য নেই, অস্থিরতা নেই, অতিরিক্ত লজ্জায় সমগ্র পৃথিবীর কাছে মুখ লুকিয়ে সে যে হঠাৎ কি করবে তার আর ঠিক রইল না। তরুণীটি লজ্জারক্ত মুখে মাটির নীচে মিশিয়ে যেতে লাগ্‌ল। বৃদ্ধ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নিস্পৃহ হয়ে বসে রইলেন।

দুলালী আবার কাছে সরে' এল। কিন্তু কি জানি কেন, আর তাকে কোলে নেবার সাহস নায়কটির হ'ল না। একটু আগে যাকে সে আপন করে' নিতে পেরেছিল, এবার হয়ত সে ভাবল, মাঝখানে সুদীর্ঘ ব্যবধান।

দুলালী বল্‌ল, কই গল্প বললে না ত'?

নায়ক তার দিকে তাকিয়ে আবার মাথা হেঁট করল। দুলালী কিন্তু ছাড়ল না, জোর করে' নায়কের কোলে চড়ে' বসে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

নায়ক একবার ও'দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, 'তোমার মা ডাকচেন বোধ হয়, যাও ঘুমোওগে। যাও ত লক্ষ্মীটি!'

'না, যাবো না। আমি থাকব তোমার কাছে।

নায়ক গল্প সুরু করল—'এক ছিল রাজা।'

'তারপর?'

'তারপর সে ট্রেণে চড়ল—'

'রাজা বুঝি ট্রেণে চড়ে? মিথ্যেবাদী!'

নায়ক বল্‌ল, হ্যাঁ চড়ে, তুমি জানো না? ট্রেণে চড়ে' যেতে যেতে সে রাণীর দেখা পায়।'

'রাণী কোথায় ছিল এতদিন?'

'বনে ছিল যে, রাজা তাকে বনে পাঠিয়েছিল।

'তারপর?'—বলে' দুলালী তার কোলের মধ্যে শুয়ে পড়ল।

'সেই বনে ছিল রাজকন্যে—'

'রাজকন্তে কোথেকে এল? বাঃ!

'রাজকন্তে রাণীর মেয়ে, তা জানো না বুঝি?'

'আচ্ছা বল।'

নায়ক বলতে লাগ্‌ল গল্প, তার আদি নেই, অন্তও নেই। সে গল্প সাহিত্যও নয়, রূপকও নয়। তা'তে স্বপ্নের রঙও নেই, জীবনের রসও নেই। ট্রেণের গল্প খেই হারানোর গল্প, খেই না পাওয়ার গল্প।

অনেক্ষণ পরে দেখা গেল নায়ক ছাড়া আর কেউ জেগে নেই।

দুলালী গভীর নিদ্রায় অভিভূত, বৃদ্ধের নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তরুণীটি জান্‌লার ধারে মাথা রেখে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েচে। 'ডিষ্ট্যান্ট্ সিগ্‌নালের' আলো দেখা যেতেই নায়ক একটু ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। ঘুম-কাতর দুলালীকে বুকের মধ্যে পক্ষী-শাবকের মত নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে বল্‌ল, 'আপনার মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে।'

তরুণীটি অলক্ষে একবার তার নিদ্রিত বৃদ্ধ পিতার দিকে তাকাল। তারপর চুপি চুপি বল্‌ল, 'শোয়াবার জায়গা ত' এখানে নেই।'

নায়ক বল্‌ল, 'একে কোলে নিয়েই আমি গাড়ীতে রাত কাটাতে পারতাম, কিন্তু এই মোকামায় আমাকে নামতে হবে।'

নায়িকা বল্‌ল, 'নেমে যাবেন? এই মোকামায়?' বলে সে জান্‌লায় মাথা গলিয়ে একবার দূর ষ্টেশনের দিকে তাকাল। কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে বল্‌ল, দিন্ আমার কোলেই দিন্ ওকে।'

মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে নায়ক সরে' এল। একটু শুধু হাসল কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বল্‌ল না। বলবার আর ছিলই বা কি! তুমি হলেও কিছু বলতে পারতে না চন্দ্রা!

নিভৃত রাত্রির অন্ধকার নিস্তব্ধতার মধ্যে ষ্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল। জিনিস-পত্র সমেত যুবকটি কাউকে কিছু না বলে' নেমে পড়ল। নেমে পড়ল বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অত্যন্ত সন্তর্পণে, অতিরিক্ত লজ্জা ও কুণ্ঠার সঙ্গে নায়িকা তাকে একবার ডাক্‌ল। নায়ক

কাছে আসতেই সে অস্পষ্ট কণ্ঠে শুধু বললো, 'আপনি চ'লে যাচ্ছেন, এবার জুনালীর টিকিট চাইলে কি বলব? পাঁচ বছর বয়েস বললে যদি তারা বিশ্বাস না করে?'

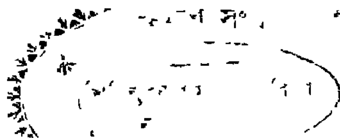
এইখানে এ গল্পের শেষ হলো। নায়ক-নায়িকার বিদায় দৃশ্য এতটুকু আবেগ-উচ্ছ্বাসিত নয়

মেয়েটির শেষ কথাগুলির মধ্যে আর কিছু ছিল কিনা কে জানে, কিন্তু নায়কটির কোথায় যেন কি মনোবিকার দেখা দিল। কয়েক পা গিয়ে সে আবার ফিরে দাড়াল, আবার কিছু দূর গিয়ে থমকে সে ফিরে দাড়াল, আবার কিছুদূর গিয়ে থমকে সে ফিরে তাকাল। মনে হলো তার সমস্ত ভবিষ্যত জীবন আজ থেকে একটি সন্দেহের দোলায় দুলবে, সে এক পাবে না, পদে পদে তার সুস্পষ্ট ধারণা চুরমার হয়ে যাবে, দুশ্চিন্তায় তার দিনরাত হবে আতঙ্ক,—নারী চরিত্রের অর্থ খুঁজতে খুঁজতে ব্যর্থ হয়ে নিজেকেও সে হয়ত একদিন দুর্বোধ্য করে তুলবে। কে বল চন্দ্রা?

[illegible] কেও [illegible] কেমন দুর্বল করে তোলে শোনো বাল:

বাগানের ধারে মাঝে মাঝে তার দেখা পেতাম।

পরণে তার গেরুয়া, এবং জীবনের যে-বয়সটায় মানুষ প্রকৃতির ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ—সেই যৌবনকাল সে গেরুয়ায় আচ্ছন্ন করে' অতিক্রম



করে' এসেচে। দূর থেকেও অনেক লোকের জটলা কাটিয়ে তার কাপড়খানি আমার চোখে পড়ত। আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতাম।

হয়ত মলিন-রৌদ্র অপরাহ্ণ। বাগানের পশ্চিম প্রান্তের গাছ-গুলিতে ক্লান্ত পাখীর দল আপন আপন অধিকার নিয়ে কলরব সুরু করেচে। রাজপথে এই সময় গজমান জনস্রোতে মুখরিত।

'বসো।

কোমরের কসিতে গোঁজা তার একটি বস্ত্রনির্মিত মুদ্রাধার সঙ্গে সঙ্গেই থাকত। কী না ছিল তার মধ্যে। বিড়ি, চুণ, চরস, পয়সা, ছুঁচ-সুতো, চিঠি—এমন আরো কত কী। থলিটি খুলে একটি বিড়ি ধরিয়ে সে আপন মনে টান্‌তে লাগ্‌ল।

'একা আমি থাকতে পারিনে, বুঝলে—একা আমার সয় না। ভিড়ের মধ্যেই একা থাকা আমার অভ্যেস।

আবার সে বিড়ি টান্‌তে লাগ্‌ল। তার মুখে চোখে ছিল একটি সহজ ঔদাসিন্য, নির্লিপ্ত জীবনের প্রশান্তি, মানুষ যেন কোথায় তার কাছে ছোট হয়ে গেচে। বললে, 'আর তা ছাড়া কি জানো, ওদের দিকে চেয়ে থাকতে আমার ভারি ভাল লাগে।'

বললাম, 'ওই ছেলেদের খেলার দিকে?'

'হ্যাঁ, ওই শিশুরা,—ওদের খেলা, ওদের আলাপ, ওদের আনন্দ!'

চুপ করে' রইলাম। এ ত' অত্যন্ত স্বাভাবিক, সন্ন্যাসীর প্রৌঢ়

জীবনের বাৎসল্য। তবু পরমায়ুর অপরাহ্ণে এসে দাঁড়িয়ে গৃহ-বৈরাগীর চেহারাটা যে কেমন হয় একে দেখবার আগে আমি এমন করে' আর বুঝিনি। এমনি করেই এই মানুষটিকে বার বার দেখে এসেচি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেখানে খেলা করে, ছুটোছুটি করে' বেড়ায়, গল বলাবলি করে' গান ধরে—সেই পথেই এর আনাগোনা। সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজায় তাকে কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। অসংখ্য ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার চোখের পলক যেন আর পড়ে না।

'তোমরা বিশ্বাস করবেনা—' থেমে থেমে সে বলতে লাগল, অথচ আমি জানি আমি কী। কী আমার পরিচয় তুমি ভাবতে পারো, আমি একদিন উচ্ছল ছিলাম? আমার গেরুয়ার নীচে ছিল একটা মাতাল মৌমাছি?'

'থাকতেই পারে।'—বললাম।

'সে কথা তুমি ভাবতে পারো?'

'তা মানুষের জীবনে ধরো—'

'না, তুমি ভাবতে পারো না।' দৃঢ়কণ্ঠে কথা কয়টি বলে' সে আবার অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

বললাম, 'সে বয়সের কথা তোমার মনে পড়ে?'

'পড়ে বৈ কি।' সে বলতে লাগল, 'এই ত মাত্র বছর কুড়ি

হলো সব থেমে গেছে। হ্যাঁ, ঝড় থেমে গেছে, যৌবনটা ঝড়েই ঝড়ের মতনই সে—'

আকাশের দিকে সে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে সে বলল, 'এমন মনে করো না আমার কোথাও বেদনা আছে, একটুও না। যে [illegible] মানুষ কল্পনা দেয় তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই [illegible]। [illegible] অথচ, দ্বিধাহীন—পথে পথে পদে পদ [illegible]। কোনদিন দুঃখের লেশমাত্র পাইনি।'

সে আবার বলল, 'মানুষের বাঁচবার মানে কী জানো? প্রতীক্ষা। জীবনব্যাপী যে-উৎসব যে-আয়োজন সে শুধু একজনের দেখা পাবো সেই আশায়।'

বললাম, 'সবাইয়েরই কি তাই?'

'সবাইয়েরই, হ্যাঁ, নইলে এর কোনো মানে হয় না। কিন্তু আমার সে প্রতীক্ষাও শেষ হয়ে গেছে, আশা করবার আর কিছু নেই। আশা মিটে গেছে।'

ক্ষোভ নেই, দাহ নেই, উত্তেজনা নেই—কথাগুলির সবল সারল্যে একটি নিস্পৃহ মনের স্পর্শ পেতাম।

অথচ এই প্রায়-বৃদ্ধ মানুষটিই একদিন দৈবের হাত এড়াতে পারল না। একদিন সে গাড়ী চাপা পড়ল। হয়ত অত্যন্ত নগণ্য

তার জীবন, অতি তুচ্ছ, তবু তাকে অকালে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন ছিল বিধাতার। তার শোচনীয় পরিণামের ভিতর দিয়ে সৃষ্টির ছন্দ বজায় রাখতে হবে।

হাসপাতালে গেলাম, তখন প্রায় সব তার শেষ হয়ে এসেচে। জীবনের কোনো আশা নেই। সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য ক্ষত, পা দুটি ভাঙা—যে পা দিয়ে সে সকল তীর্থ পরিক্রম করেচে, সকল দেবালয়।

চোখ দুটি খুলে সে একটু হাসল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'সব গল্পটা আর তোমাকে বলা হলো না—এখন আর সময় নেই।'

পাশের বিছানাটায় একটি বছর দশেকের ছোট ছেলে কি এক দুরারোগ্য রোগে নির্জীব হয়ে শুয়েছিল, সেই দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'খরচ—খরচ শুধু, সঞ্চয় নেই, কিন্তু দুঃখ কি জানো ?

কথার পরিশ্রমে মুখ বিকৃত করে' সে হাঁপাতে লাগল। তখনো তার সর্ব্বদেহের ক্ষতগুলি দিয়ে একটু আধটু রক্ত গড়িয়ে আসছিল। বীভৎস তার চেহারা,—অস্বাভাবিক মৃত্যুর অকরুণ দৃশ্য সমস্ত হাসপাতালটিকে অভিভূত করে' রেখেছে, অগণ্য মৃত্যুর দল কতকগুলি নিরপরাধ জীবনকে যেন বন্দী করেচে এখানে।

'লুঠ করে' শুধু নিয়েই গেলাম, রেখে গেলাম না কিছু।'

চোখ দিয়ে তার জলের ধারা গড়িয়ে এলো। বলল, 'ভাবতে পারো, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার যা কিছু সব—কিছুই রইল না!'

বললাম, 'তার জন্যে দুঃখ কিসের?'

'দুঃখ কিসের?'—একটুখানি সে উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'তুমি বুঝবে না, তোমার এখনো চুল পাকেনি—তাহলে বুঝতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাওয়াটা কি যন্ত্রণার।'

ভাবলাম, বলি, তুমি ত সন্ন্যাসী, জীবনকে অস্বীকার করাই ত তোমার ধর্ম, তোমার তপস্যা। কিন্তু চুপ করেই রইলাম। আশা করেছিলাম, প্রশান্ত ও নির্লিপ্ত হৃদয় নিয়ে সে মৃত্যুকে বরণ করবে, কিন্তু তা আর হলো না,—চোখে এল তার ক্ষুধা, মুখের পরে একটি আরক্ত উত্তেজনা,—লোভাতুর উৎসুক দৃষ্টিতে সে পাশের বিছানাটার দিকে চেয়ে বলল, 'অমনি একটি সন্তান, হোক চিররুগ্ন, বিকলাঙ্গ, হোক সে অকর্মণ্য ··তবু—'

আবার তার চোখে জল গড়িয়ে এল।

শোন চন্দ্রা:

তীর্থের পথে আর একটী অল্পবয়সী সন্ন্যাসীর সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। পরণে একখানি ময়লা গেরুয়া, কাঁধে পাঁচ সিকে দামের একটী তুলার কম্বল। ছেলেটী অনেক জায়গায় ঘুরেছে, বেশ্যা অবশ্য করেনি। অন্ততঃ তার কথায় বিশ্বাস করা উচিৎ।

চোখ দুটী অর্দ্ধমুদ্রিত করে নিজের ভ্রমণ-কাহিনী একবার সুরু করলে থামানো মুস্কিল। জাতে সে কৈবর্ত্ত। বাপ হচ্ছে মস্ত বড

কারবারী। আত্মীয়-স্বজন সবাই আছে। প্রথম ছেলেটীকে আবিষ্কার করলাম বোম্বাইয়ের এক ধর্ম্মশালায়। কোনো মানুষকে দেখলেই সে কেমন যেন আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে তার ওই গল্প শুনিয়ে। কোথায় নেপালের পশুপতিনাথ থেকে আরম্ভ করে' সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত গল্প তার বসে বসে শুনতেই হবে।

বলে—'বুঝলেন? দেশ যদি স্বাধীন না হয় ত' কিছুই যায় আসে না, তীর্থ স্থানগুলো যতদিন আছে ততদিন আমরা কারোকে পরোয়া করিনে।'

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে তাকে একবারও অনুরোধ করিনি, কারণ যেখানে তাকে দেখলাম, সেটা ধর্ম্মালোচনার উপযুক্ত আবহাওয়া নয়। একটী ব্রাহ্মণের ছেলে তার সঙ্গী। নাম—চাটুয্যে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, বাড়ী বুঝি ভাটপাড়ায়। দুটী স্ত্রীলোককে নিয়ে চাটুর্য্যে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পথে অজীর্ণ রোগাক্রান্ত এই সন্ন্যাসীটী তার সঙ্গ নেয়। বলে, '—টাকাকড়ি সঙ্গে রয়েচে চাটুয্যে মশাই...... দেহে তেমন শক্তি-সামর্থ্য নেই, আমি আপনার সঙ্গেই ঘুরবো।'

তা সত্যিই বলেছিল। দেহখানি যেন একটী পাকানো বেত। অম্ল আর অজীর্ণ রোগে সমস্ত রস একেবারে শুষে নিয়েচে। গোঁফ-দাড়ির সম্বন্ধে বিধাতার অতিরিক্ত কার্পণ্য প্রথমেই নজরে পড়ে। ছোট ছোট চোখ দুটীর মাদকতা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

ঠাকুর দেবতার নাম করলেই সে একেবারে গদগদ হয়ে ওঠে। প্রথমে এক আধটা কথা তার সঙ্গে কইলেই মনে হয় তার রোগাক্রান্ত দেহের আজন্ম দুর্ব্বলতাই তার চরিত্র এবং পুরুষত্বকে নষ্ট করে দিয়েচে। কথা সে বলে রুগ্না নারীর মত—সে কথা এমনই নিস্তেজ।

রান্নাবান্না ওই মেয়ে দুটোই করে। পতিতা মেয়ের হাতে খেতে অবশ্য তার বাধা নেই। এ সম্বন্ধে উল্লেখ করতেই সে কাপড় জড়ানো ছোট একটা পুঁটুলি খুলে 'ভুবনেশ্বর' বড়ি আর মকরধ্বজ বার করতে করতে বল্‌ন—'এসব কিছুই নয়, বুঝলেন না? পাপ করচি মনে থাকলে পাপ যেতে বেশীক্ষণ লাগে না।

এমনি অসংলগ্ন কথা সে প্রায় সকল সময়েই বলতে পারে। তবে কথা বলবার ধরণ দেখলে মনে হবে লেখাপড়া সে কিছু কিছু জানে। পূজো করতে একবার সে বসলে তাকে ওঠানোই মুস্কিল হতো। খাবার দেওয়া হয়েচে না বললে তার চুপি চুপি মন্ত্র পড়া আর থামতেই চাইত না। আহারাদি সম্বন্ধে চাটুয্যে যখন পাশে বসে ঘন ঘন সতর্ক করতো, সে তখন আমার ঘরের দিকে চেয়ে লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে বলতো— 'শুনতে পাবে যে একটু গলা খাটো করে' বল না চাটুয্যে মশাই!',

উত্তরে মেয়ে দুটি কলকণ্ঠে হেসে উঠে কি একটা মন্তব্য করে বসতো।

এমনি এক আধটা দুর্ব্বলতার সন্ধান সে নিজেই দিয়ে ফেলে। হয়ত ঘরে ব'সে আছি, এক সময় এসে বল্‌ল—'বামুন ঠাকুরের কি রুচি। ওকে খাইয়ে দিচ্ছে-ছি।

চুপ করেই রইলাম। সে বল্‌ল—'ভালবাসলে কি জাতের বিচারও থাকে না ? তা ছাড়া বিয়ে করা বৌ যখন নয় তখন—'

এমনি এক আধটা মন্তব্য সেও না ক'রে থাকতে পারতো না। অবশ্য নিজের অসুবিধাকে সে অনেক পরিমাণে মানিয়ে নিয়েছিল। পরের বাধ্য-বাধকতায় গেলে নিজের দাবী কি আর সব সময় খাটানো চলে ? বিশেষ ক'রে চাটুয্যে যখন মেয়ে দুটোর সঙ্গে হাসি-তামাসায় ঘরখানা মুখর ক'রে তুলতো—তাকে তখন একটু বিপদেই পড়তে হতো, নিরিবিলি জায়গার অভাবে দু'দণ্ড চোখ বুজে সে বসতেই পারতো না! অর্থাৎ স্ত্রীলোকের হাসির আওয়াজে তার মনের সমস্ত ধর্ম্মভাবটুকু এক মুহূর্ত্তেই উবে যেত। মন্দিরে গিয়ে সে ঠাকুর দর্শন করবার সময় পেত না, মেলায় ঘুরে ঘুরে ততক্ষণে মেয়েদের জন্ম সৌখীনজিনিস কিনতে হতো। একদিন নাকি তাড়াতাড়ি গাড়ী ধরবার আগে সে মেয়েদের খাবার পরিবেশন করছিল। নিজের প্রতি নিজেই সে সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে বল্‌ল এসব কিছুই নয়। বুঝলেন ? আমি যদি ঠিক থাকি তা হলে সব কাটিয়ে চলে যাবো। আগুনের ওপর কি আর জঞ্জাল দাঁড়াতে পারে ?

তার মধ্যে ভগবৎ প্রেরণা ছিল কিন্তু শান্তি ছিল না। পেটের পীড়া তাকে কোথাও আরামে থাকতে দেয়নি। অত্যন্ত অসময়ে এবং রাতে-ভিতে-অকস্মাৎ তাকে অদৃশ্য হতে দেখে দুঃখই হতো। সন্ন্যাসী হয়ে সে যে কেন এই তামসিক ভোগবাদের পিছু নিয়ে রাস্তায় নেমেছে তার স্পষ্ট অর্থ বুঝতে পারতাম না। মন তাকে ঘরছাড়া করেচে কিন্তু দেহের কারণে সে বেচারি পরাধীন। আহার সম্বন্ধে সে যথেষ্ট বাদ বিচার ক'রে চলে। অবসর সময়ে এটুকু সেটুকু সঞ্চয় ক'রে না আনলে তার মন বড় খুঁৎখুঁৎ করে। চাটুয্যে এ নিয়ে হাসাহাসি করলেই সে একটুখানি উত্তেজিত হয়ে বলতো—পেটুক আমি নই, বুঝলে চাটুয্যে মশাই? যা কিছু খাই সবই ওষুধের সামিল, তা বলে পেটুক নই।

মেয়ে দুটির তরফ থেকে তাকে অপ্রস্তুত এবং বিদ্রূপ করবার একটি বিশেষ চেষ্টা প্রায়ই লক্ষ্য করতাম। বেচারি কোন জটিল কথার উত্তর দিতে পারতো না। মনে হতো এদিক দিয়ে সে অত্যন্ত অভিমানী, এতটুকু আঘাত কোথাও পেলে মনে মনে সেটিকে নাড়াচাড়া করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে।

বড় মেয়েটি বয়সে প্রায় চাটুয্যের সমান, দেখলে একটু গম্ভীর বলে মনে হতে পারে। ছোট একটু উচ্ছল, বলতো—পান এনে দেবো? পান খেলে অম্বলের ব্যামো ভাল থাকে।

সন্ন্যাসী জবাব দিত—তা দেবে দাও, পান অনেক দিন খাইনি।

পান হাতে নিয়ে বলতো, চুণ অমনি একটুখানি।

ছোটটি আঙুলে আঙুলে ঠেকিয়ে চুণটুকুও দিয়ে যেতো বল্‌তো বিছানা করে দোব?

বিছানা? তা যদি পারো তা হলে,—আচ্ছা ঐ কম্বলখানাই পেতে দিয়ে যাও। তোমাদের মতন অমন নরম করে বিছানা আমি করতে পারিনে, কেন বল ত?

আমাদের যে মেয়েমানুষের হাত।

ও তাই বটে।

মনে হতো গৃহীর গোপন ক্ষুধা তার মধ্যে কোথায় যেন জড়িয়ে আছে।

মেয়েদের সঙ্গে এর বেশী কথা সে আর কী বলতে পারে? কেন জানি না, তাকে দেখলেই মনে হতো লোকটি উপবাসী। সে যে ঠিক মিথ্যাচারী তা বলিনে, কিন্তু একটি অস্বাভাবিক সাত্ত্বিকতার আবরণে আপনাকে ঢাকি দেবার কেমন একটি চেষ্টা তার সমস্ত চেহারা থেকে ফুটে উঠতো। তাকে দেখে শ্রদ্ধার চেয়ে মনে মনে বেদনারই উদ্রেক হতো। দেহের শীর্ণতার মধ্যে তার কোনো তেজ ছিল না। হাত পা গুলি রক্তহীন, চোখের কোণে কালি, সর্ব্বাঙ্গে গ্লানির একটা ছায়া—সর্ব্বদাই যেন চিঁ চিঁ করচে।

রাত্রে সবাই একটু বিপদে পড়ে। একখানি মাত্র ঘরে ওদের চারজনের সঙ্কুলান হওয়া ভারি কঠিন। পথে আসতে আসতে এতদিন সব জায়গাতেই একটি মাত্র ঘরে সন্ন্যাসীকে এই পতিতা মেয়েটির সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হয়েছে। চাটুয্যে অত গ্রাহ্য করে না—কখনো বলেই রসিকতা করতে ছাড়ে না। বলে—আগুনের ওপর ভক্সাল দাঁড়ায় না কি বল ঠাকুর?

ঠাকুর বলে—একি সত্যি নয়?

আরে সত্যি কথাই ত বলচি। তবে এ কথাও ত সত্যি যে পাথরও আগুনে পোড়ে?

তার মানে?

আত্মার ক্ষুধাকে সে যে অস্বীকার করে চলেচে—একথা চাটুয্যে যেন কেমন করে বোঝে! কিন্তু ঠাকুরের আর কোনো উপায় ছিল না। একা তার পক্ষে সন্ন্যাস জীবন যাপন করা কিছুতেই চলে না।

তবুও কোন কোন দিন রাত্রে ঠাকুর একসঙ্গে শুতে পারতো না। মনে হতো সে যেন কোথায় একটা অস্বস্তি সৃষ্টি করেচে। জানলার কাছে বসে তার ভাবভঙ্গী দেখতাম।

এদের এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোনো অর্থ খুঁজে পেতাম না। বন্ধ-দরজার বাইরে দালানে শুয়ে ওপ্সি

আর সন্ন্যাসীটি যখন অন্ধকারে একটু একটু গল্প করতো তখনও কি কোনো অর্থ আবিষ্কার করতাম?

সকাল বেলা উঠে দেখতাম মাঝে খানিকটা ফাঁক রেখে দুজনে গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

এক একদিন আবার তপ্সির বদলে সোনামুখি এসে বাইরে শুতো, সেদিন আর গল্প জমে না—সন্ন্যাসীর প্রতি সোনামুখির মৃদু মৃদু তিরস্কারের ভাষা শুনতে পেতাম। তিনটি নরনারীর এই পঙ্কিল জীবনের জঘন্যতা কি সন্ন্যাসীর মনে কোনো ছাপ ফেল্‌তো না? কিছুই বুঝতাম না, এর তলায় তলায় মানব-জীবনের কি কোন নিগূঢ় মর্ম্মকথা আত্মগোপন ক'রে ছিল?

এখান থেকে চলে যাবার দিন হয়ে এসেছিল। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে মনে হলো, হোক সে দুর্ব্বল, হোক কাপুরুষ—সংসার যদি তাকে অক্ষম বলে' বাতিল করে দিয়ে থাকে ত দিক্,—অপমানিত, ব্যর্থ বেদনাময় জীবনের গভীর রহস্যের ইঙ্গি[illegible] কিছু কিছু জানে। যাবার সময় মৃদু হেসে আমাকে বিদায় দিয়েছিল।

নিজের কাছেই মানুষ কী দুর্ব্বোধ্য তা আমি কিছু কিছু জানি। একজনের সঙ্গে শেষের দিন কী কথা হয়েছিল তাই তোমাকে বলি, শোনো চন্দ্রা:

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল। বললাম —একটুখানি বসবে ?

নদীর উপর অন্ধকার থম থম করচে, বিস্তীর্ণ বালির চড়াটা আর দেখা যাচ্ছে না। কথা বলবার সময় সেইদিকেই চেয়েছিলাম। তবুও বুঝতে পাচ্ছিলাম, অলকার পা টলচে। কি একটা সুতীক্ষ্ণ মনোভাব অনেকক্ষণ থেকে তাকে উদ্বেল করে তুলেছিল।

কাঠের এক টুকরো তক্তার ওপর বসে' পড়বার আগে সে বলল— রোগা শরীর, দাঁড়াতেও আর পারিনে। কিছু দিন থেকে শরীরটা যে কেন এমন আস্তে আস্তে ভেঙে পড়চে বুঝতেই পাচ্ছি না। কোনো ওষুধ তুমি জানো যাতে আরো কিছুদিন আমাকে সোজা করে' রাখতে পারে ?

একটুখানি হাসলাম।

অলকা বলল—না না, তা বলিনি, আমাকে ভুল বুঝ না, দেহের খাঁচুনিটাকে বেঁধে রাখতে চাইনে, প্রাণটাকে শুধু ধরে রাখবার কথা বলচি। সহজে মরতে কে চায় বলতে পারো ?

অলকার মুখে একটু একটু মদের গন্ধ পাচ্ছিলাম। অন্ধকারে চোখে তার জলের আভাস দেখে বললাম—হঠাৎ নেশা করতে গেলে কেন ? স্ত্রীলোক হয়ে—

সে বলল—দিব্যি করে' বলচি, তোমার কাছে মিথ্যে বলবো না।

ওই যোগীনবাবু, ও আমায় কিছুতেই ছাড়লো না। মন্দিরে পুজো দিতে বেরিয়েছিলাম, পথে দেখে… তারপর বেড়িয়ে আসতে গিয়ে এই শাস্তি।

বললাম—দেখলাম বটে তোমার যোগীনবাবুকে, ধনবান বলেই যেন মনে হলো। কিন্তু ও-লোকটি আবার জুটলো কবে থেকে?

অলকা একটু দুঃখের হাসি হাসলো। বলল—আর বলো না, একটা মেয়ে ইস্কুলে পড়তাম, ও হচ্ছে সেখানকার সেক্রেটারী। লোকটি যেমন গম্ভীর তেমনি সচ্চরিত্র। একদিন একটু বাজিয়ে দেখবার ইচ্ছে হ'ল। হেসে কি যেন একটা বলেছিলাম, লোকটি তার পরদিন আড়ালে পেয়ে আমাকে বলল, চুলোয় যাক্ আমার স্ত্রী, তোমার মতন আর কাউকে এত ভালবাসিনি। —ব্যাস্, তারপর দুজনে বেরিয়ে পড়লাম আর কি!

উদ্যত কৌতূহল চেপে রেখে বললাম—এই যে নবদ্বীপ না কোথায় এর আগে ছিলে?

হ্যাঁ, সে বোধ হয় তুমি জানতে। গোঁসাইজির সঙ্গে ত তোমার আলাপ ছিল।

সেখান থেকে চলে এলে কেন?

নেশাই করুক আর বিভ্রান্তই হোক্—বেশ বুঝলাম, লজ্জায় অলকার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ পরে মাথা তুলে দ্বিধাজড়িত

মৃদুকণ্ঠে সে বললে—শুনেই যাও, একটি ছেলে হয়েছিল,—মরা। গোঁসাইজির ওখানে তাই আর থাকা চললো না, নবদ্বীপে যে তাঁর অনেক খ্যাতি।

অলকা পুনরায় বললে—ছেলে থাকলে আমায় কি কেউ জায়গা দিত মনে কর? দুজনে মিলে তখন খেতাম কি? আমার দেহটার দাম যদি বা কিছু থাকে, সন্তানের দাম কি কেউ দেবে?

চুপ করে রইলাম। একটু পরে বললাম—যতদূর মনে পড়ে বিয়ে হবার পরেই তুমি সেই ডাক্তারের সঙ্গে চলে গিয়েছিলে। তারপর একবার শুধু তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

অলকা এবার একটু অধীর হয়ে উঠলো বললে—একটা মেয়ে অমুকের সঙ্গে চলে গিয়েচে তোমরা শুধু এইটুকুই জেনে রাখো, এই খবরটাই সংসারে সত্যি হয়ে ওঠে, কিন্তু কত বড় দুঃখ বুকে নিয়ে যে তারা পথে নামে, কতখানি আঘাত পেলে ...যদি তোমরা জানতে তা হলে—

হঠাৎ থেমে সে নিজেই বললে—থাকগে, অনেক বক্তৃতা দিয়েচি।

বললাম—না, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। বলছিলাম যে, পুরুষ পরীক্ষা করে বেড়ানোটা—

অলকা বেশ স্পষ্ট করেই বললে—তার মানে, প্রকারান্তরে তুমি আমাকে চরিত্রহীন বলতে চাও—এই না?—অন্ধকারে একটুখানি

হেসে সে আবার বললে—আর তা ছাড়াই বা আমি কী বল? মেয়েমানুষ হয়ে পুরুষ মানুষকে বিচার করে তার সঙ্গে ঘর করতে গেলেই আমার মতন সমস্ত জীবন ধরে দুঃখ পেতে হয়। মানুষের মতন মানুষ কি আর মেয়েরা কোনদিন পাবে তুমি মনে কর? সে মানুষকে যে দেবতা হতে হবে!

আবার অলকা বললে—আর তা ছাড়া কি জানো, স্বামীর ঘর ছাড়লে পৃথিবীতে আর কোনো নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে ভারি কঠিন। যে-গাছের গোড়া নেই তার আগায় কি আর ফুল ফোটে?

বেশ বুঝতে পাচ্ছিলাম অলকার কথাবার্ত্তা ক্রমেই অসংলগ্ন হয়ে আসচে, শরীরটাও তার বসে বসে গল্প করবার উপযুক্ত নয়। বললাম —রাত হলো, যোগীনবাবু বোধ হয় ব্যস্ত হয়ে উঠবেন এর পরে।

রাম বল। ব্যস্ত।—গিয়ে দেখবো হয়ত আহ্নিকে বসেচে! মাতাল হলে বুঝতাম কিন্তু তার চেয়েও খারাপ, লোকটা ভণ্ড। মদের ঢেকুর তুলে মহাদেবের মন্ত্র পড়ে। ব্যস্ত সে আমার জন্যে এতটুকু নয়। নিতান্ত আজ আমাকে ধরেচে তাই, নৈলে—

এবার অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। ঘাটে দু একটি আলো যা জলছিল তাও নিবে গেচে। খেয়ানৌকার টিমটিমে এক একটি

আলোর রেখা কেবল নজরে পড়ছিল। মাথার উপর শুধু এক আকাশ তারা ঝলমল করচে।

জলের দিকে চোখ ফিরিয়ে এক সময় অলকা বল্‌ল—একটি কথা বললে তুমি হয়ত এখুনি হেসে উঠবে! কিন্তু একথা তুমি ছাড়া হয়ত আর কেউ বিশ্বাস করতো না।

বললাম—বলই না কী কথা?

একটু থেমে অলকা বলল—তোমাকে কাছে পেয়ে আমার কেবলই কাঁদতে ইচ্ছে করচে। আর খানিকটা নেশা করলে এতক্ষণ বোধ হয় কেঁদেই ফেল্‌তাম—নয়?

কেন বল ত?

অলকা বল্‌ল—যে আমার সব জানে তার কাছে আমি আর নিজেকে লুকোতে পারিনে।

বললাম—মানুষের সবটা কি জানা যায়?

তা যায় না, যায় না বলেই ত এতকাল এই চোখ দুটো নিয়ে পথে-বিপথে ঘুরে' বেড়ালাম! আচ্ছা, তুমিই বল না, একি আমার অন্যায়? দুষ্টলোককে—তা সে যেই হোক—আমি সহ্য করতে পারিনে, সেটা কি আমার এত বড় পাপ।

বললাম—এত' পাপ-পুণ্যের কথা নয়, এ তোমারই কথা।

হ্যাঁ, আমিও তাই বল্‌চি, বুঝলে? আমার সত্যি কথা হচ্চে যে

একজন কারো আশ্রয়ে না থাকলে আমি বাঁচতেই পারিনে। আমি যে স্ত্রীলোক। অথচ মনের মত মানুষটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে—অলকা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নদীর দিকে তাকাল।

দুজনেই এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—এই শরীরে একলা বাসায় ফিরতে পারবে?

খুব। নেশা ত আজ নতুন নয়!—বলে অলকা বেশ সহজেই আস্তে আস্তে চল্‌তে লাগল।

পথে একটা গলির মধ্যে চলে' যাবার আগে ঠিকানাটা দিয়ে সে বল্‌ল—সামনের বুধবারে উনি যাবেন গয়ায় পিণ্ডি দিতেদিন দুয়েকের জন্যে। এই সময় তুমি একবার এসো আমার কাছে, অনেক কথা আছে। মাথার দিব্যি রইল।

সাপের মত এঁকে বেঁকে গলিটার মধ্যে সে চলে গেল, তার গতিভঙ্গী যদি কেউ দেখতো তা হলে বল্‌তো, তার অনুতপ্ত জীবন এতটুকু তাকে ক্লান্ত করতে পারেনি। জানি মানুষের কাছে অলকা ঘৃণাই পাবে শ্রদ্ধা পাবে না। তার সতীত্ব নিয়ে কথা উঠবে, অথচ আমি জানি কী যন্ত্রণায় সে এই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েচে।

মলিনার মত মেয়েকেও সহজে কেন বোঝা যায় না সে কথাটাও তোমাকে বলি চন্দ্রা শোনো:

রঙীন সুতো

তিন ক্রোশ পথ হেঁটে গেলে তবে ষ্টেশন্। ছোট ছোট খাল-বিলগুলি বর্ষার ঘোলা জলে পরিপূর্ণ হয়ে পথ আগলে রয়েছে। শ্রাবণের শেষ বর্ষণের পর উপরের আকাশ পরিচ্ছন্ন, নির্ম্মল নীল, সাদা কতকগুলি মেঘের টুক্‌রো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল। দিগন্ত প্লাবিত করে উজ্জ্বল রৌদ্রকিরণ শিশির-সিক্ত প্রান্তরের উপর ঝিক্‌মিক্‌ করচে।

নির্জ্জন মাঠের উপর দিয়ে আমরা দুজনে যাচ্ছিলাম। স্যাট্‌কেশটা আমার হাতে, মলিনার কাছে জলের ফ্লাস্ক্‌, জুতোটা তাকে হাতে করে নিতে হয়েচে, হাঁটুর কাছে কাপড় তুলে জল পার হতে গিয়ে সুন্দর পা দুখানি তার কর্দ্দমাক্ত; সে আসছিল পিছনে পিছনে।

পায়ে হাঁটা পথটা একখানি গ্রামের ধার দিয়ে চলে গেচে। তারই দিকে মুখ ফিরিয়ে হাত দিয়ে চোখে সূর্য্যের কিরণ বাঁচিয়ে মলিনা বল্‌লে, 'এ গ্রামের কি নাম বলত' ?'

বললাম, 'তোমার এদিকে শ্বশুরবাড়ী, তুমি জানো না ?

আর কোনো কথা হলো না, নিঃশব্দে চলতে লাগ্‌লাম। পথ এখনো অনেক বাকী, বহুদূরে ষ্টেশনের পাশে জল-সংরক্ষণের বড় ট্যাঙ্ক্‌টা এখান থেকেও দেখা যাচ্ছিল, সেইটিই ছিল আমাদের পথ-নির্দ্দেশ। মাঝে মাঝে আমরা ছোট ছোট জলাশয়ের উপর দিয়ে অনভ্যোপায় হয়ে হেঁটেই পার হচ্ছিলাম, ঘণ্টাখানেক এমনি করে এসে

মলিনা এক সময় বলল, 'সাবধান, সাপের ঘাড়ে যেন পা দিও না, জল-ঢোঁড়ারা ড্যাঙায় উঠে রোদ পোয়াচ্চে। বাবা, বড় ভয় করে। আচ্ছা, ওই না সোনামুখীর জলকর, মাছ মারে না ওখানে? যাই বল, নোনাভাঙড় আমার কিন্তু খেতে ভাল লাগে না।'

এমনি করেই খাপছাড়া কথা কইতে কইতে এতটা পথ সে এসেচে, কখনো উত্তর দিয়েচি, কখনো দিইনি। কিছুদূর এসে আবার সে হেসে বল্‌ল, 'কাপড় তুলে হাটচি, অথচ পেছন দিকে পেটিকোটের খানিকটা ভিজ্‌লো কেমন করে বুঝলাম না, কাদাও লেগেচে, লোকে দেখলে মনে করবে কি?'

গাঙচিল চেঁচাতে চেঁচাতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্চে, ছোট ছোট বক চরচে জলের ধারে ধারে—সুমুখে পতিত জমি, সেখানে চাষ হয় না অথচ ঘাসে ফুল ফোটে। সেই অনামা ফুলগুলির রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষ গন্ধ নাকে আসচে। গ্রামের প্রান্তসীমায় কতকগুলি সাদা কাশফুল মাথা দোলাচ্ছিল।

মাঠের মাঝখানে একটা প্রাচীন বটগাছের ধার দিয়ে পার হচ্ছিলাম, তারই ছায়ায় এসে মলিনা বল্‌ল, 'একটু বসে যাই বাপু, এক নিশ্বেসে এত হাঁট্‌তে পারিনে, আর কতখানি পথ আছে?' বলে সে বটগাছের বাঁধানো বেদীর উপর জুতো জোড়াটা রাখ্‌লো।

'এই ত এসে গেচি, আর কোশ খানেক।'

কোমরের কাপড় দু'হাতে টেনে সে কষি গুঁজলো, বল্‌ল, 'সেই সকাল থেকে হাঁট্‌চি,—ওমা, এখানে সিঁদুর মাখানো ঠাকুর রয়েচে, এর ওপর জুতো রাখলাম ?' বলে সে সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকালো, তারপর হেসে আবার বল্‌ল, 'ভাগ্যি কেউ নেই এদিকে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, একটু বসো ?'

আঁচল দিয়ে সে তার পথক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত রাঙা মুখখানি মুছে ফেললে, তারপর বেদীর উপর উঠে বসে বল্‌ল, 'তেষ্টা পেয়েচে, জল খাবে ? খাবে না ? তবে আমিই একটু......জল না খেয়ে আমি বাপু থাকতে পারিনে ।'

ফ্লাস্কের ছিপি খুলে সে এমন করেই জল খেল যে অধর থেকে গলায়, এবং গলা থেকে বুকের আঁচল পর্য্যন্ত ভিজে গেল ।

তারপর সে স্থির হয়ে বসল। বল্‌ল, 'তোমাকে কড়া কথা শুনিয়ে দিলে ওরা, তার জন্যে কিছু মনে করো না। আমার মুখ চেয়ে...উনি থাকলে হয়ত এত গণ্ডগোল হতো না।'

একটু হেসে চুপ করে রইলাম। গায়ে গা ঠেকিয়ে মলিনা বসেছিল, এবার কাৎ হয়ে আমার পায়ের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। বল্‌ল, 'বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে, আঃ। কাল রাতে এক মিনিটও চোখ বুজিনি। আচ্ছা, আমি যে অত ঝগড়া করতে পারি, মুখ খারাপ করে

গাল্ দিতে পারি, তোমার একটু আশ্চর্য্য ঠেক্‌লো না? ছোট বেলা থেকে তুমি কোনোদিন আমার মুখে—?' বলে সে মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগল।

মাথার উপর বটগাছের পাতায় পাতায় বাতাসের শব্দ হচ্ছিল, তারই কোন্ নিভৃতে কয়েকটা শালিক কলরব করচে। মাঝে মাঝে একটা কাঠবিড়ালী এসে চকিতে ঘুরে যাচ্ছিল।

'—একদিন দেখো এই পথটা দিয়ে আমি একলাই যাতায়াত করব, এই পথটার জন্যেই শ্বশুরবাড়ী আমার এত ভাল লাগে। হাসচ বুঝি? তা স্বামীকে কোন্ মেয়েই বা ছেড়ে থাকতে পারে বল ত? স্বামী যদি মনের মত হয় তবে—'

একটু থেমে মলিনা বল্‌ল, 'তোমাকে বলতে আমার কিছু লজ্জা নেই, আর এখানে কেই-বা আছে —'

বললাম, 'ঘুমে যে তোমার চোখ জড়িয়ে আসচে, এখনো এতটা পথ।'

মলিনা সে-কথা কানে নিল না, নিদ্রাজড়িত চক্ষে বলতে লাগল, 'একটি দিনের কথা আমার মনে পড়চে, আমার সব চেয়ে স্মরণীয় দিন—তোমাকে ছাড়তে হবে একথা যেদিন জান্‌লাম সেদিনের কথা বলচিনে—'

একটু থেমে সে বলল, 'যেদিন যোগানন্দকে দেখলাম। সে যে কী আনন্দ, তোমায় বলতে পারব না, নিষ্কলঙ্ক আনন্দ! বড় একটা

মানুষ চোখের সামনে যখন এসে দাঁড়ায় তখন নিজেকে কত ক্ষুদ্র মনে হয়, কত তুচ্ছ! ভাবতে পারো একটা লোক জীবনে কোন দিন অন্যায় করেনি, অধর্ম্ম করেনি,—সত্যিকারের বড় চরিত্র কাকে বলে জানো?

'আমিও জানতাম না।' মলিনা বল্‌তে লাগল,—বড় লোককেই জানি, বড় মানুষকে জানিনে। চোখে তার স্বপ্ন, বুকে বলিষ্ঠতা, চরিত্রের অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য,—এক হাতে আশা অন্য হাতে আশীর্ব্বাদ, মানুষের পরে নিঃস্বার্থ সহানুভূতি,— মাথা আমার হেঁট হয়ে এল।'

আর সে বল্‌ল না, চোখ বুজে পড়ে রইল, নিশ্বাস দ্রুততর বইতে লাগল।

মনে হ'ল পায়ের উপর মাথা রেখে বুঝি বা ঘুমিয়ে পড়েচে, কিন্তু হঠাৎ এক সময় জেগে উঠে বলল, 'সেদিন আমি শ্রদ্ধা করতে শিখলাম, সত্যি বলচি তোমাকে, আমার শ্রদ্ধায় কোনো ফাঁকি ছিল না, কোনো গলদ—'

তরকারীর বোঝা মাথায় করে একটা লোক এইদিকে তাকিয়ে গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছিল। বটগাছের সুস্নিগ্ধ ছায়ার উপর দিয়ে সূর্য্য একটু একটু সরে যাচ্চে, দূরে দিগন্তবিলীন মাঠের পরে উদার নীল আকাশ নেমে গেচে, তারই কোল ঘেঁষে একদল পাখী সার গেঁথে এইদিকে উড়ে আসছিল। বেলা অনেক হয়েচে।

'দিদিমার বলবার আগেই মন্দিরের সিঁড়িতে সাষ্টাঙ্গে গলায় আঁচল দিয়ে যোগানন্দর পায়ের ধুলো নিলাম, তিনি স্নিগ্ধ হেসে আশীর্ব্বাদ করলেন। মনে হল আমার পরমায়ু যেন বেড়ে গেল।'

মিনিট দুই পরে সে হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে হেসে উঠ্‌ল, সে-হাসি সুমুখে জলের বাঁধটার উপর দিয়ে ওপারে মাঠের বহুদূর পর্য্যন্ত ছুটে গেল,— 'পূজো করলাম, শ্রদ্ধা করলাম, কিন্তু,—জানো সে গল্পটা বলেচি তোমাকে ?' চোখ খুলে সে মুখের দিকে তাকাল।

'বলনি ত ?'

'বলিনি বটে। বলিনি যে যোগানন্দ সন্ন্যাসী নয়। সত্যি, যোগানন্দ সন্ন্যাসী হলে পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম হতো। আমি বুঝলাম সে কী ? তোমাদের কখন্ চেনা যায় জানো ?—যখন আমাদের কাছাকাছি আসো,—যোগানন্দর প্রতি শ্রদ্ধা এখন আমার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেচে।'

'কি রকম ?'

'সে স্বর্গলোকেরও নয়, দেবতাও নয়। সে আমার শ্রদ্ধা ভক্তিকে নষ্ট করে দিয়েচে। হাঁা, জানি, তুমি বল্‌বে মেয়েদের মন এমনি তরল, এমনি ভঙ্গুর—কিন্তু কী করব বল!'

'শ্রদ্ধা গেল কেন ?'

'ভালবাসলাম যে! সে যে এখন আমার স্বামী, আমাদের ভিতরে

এখন স্নেহ ও শ্রদ্ধার অস্বাভাবিক সম্পর্ক নেই।'

'কী আছে এখন?'

'তোমার মুণ্ডু। চল যাই।' বলে মলিনা স্বচ্ছ আনন্দে আর একবার হেসে উঠে দাঁড়াল।

শুনলে ত চন্দ্রা? মলিনা ঠিক কেমনটি তাই নিয়ে ভাবছিলাম একটি গল্প রচনা করব।

সকাল বেলাতেই লিখতে বসলাম। আবহাওয়াটি বেশ লিখবার মত। প্রাতঃকাল থেকে অতি মন্থর এবং নিঃশব্দ বৃষ্টিপাত হচ্ছিল, মাঝে মাঝে জলের হাওয়া উঠে দরজা জানলা কাঁপিয়ে হু হু করে বয়ে যাচ্ছে। দু'দিন ধরে এত বর্ষণ হল তবু দিবারাত্র আকাশে ঘন মেঘের আয়োজন ক্ষান্ত হল না। ভাবছিলাম, বুঝলে চন্দ্রা, মলিনাকে নিয়ে একটি করুণ ও মধুর ভালবাসার গল্প আজকের এই সজলতার মধ্যে শেষ করব, একটি অতি মোলায়েম ছড় টেনে পাঠকের মনে সেই চির-দিবসের বিচ্ছেদের সুর ধ্বনিত করে তুলবো।

যে ঘরটিতে বসে আমি লিখবার চেষ্টা করছি, তার চারিদিকে আমার প্রতিবেশীর ঘরে প্রতিক্ষণেই একটা কিছু কলরব এবং জটলা লেগেই থাকে, আজ এই বর্ষণ-মুখর প্রভাতেও তার ব্যতিক্রম নেই।

মনে মনে মলিনার সঙ্গে একটি নায়কের চরিত্রসৃষ্টি করে কী নাম

দেবো ভাবচি এমন সময় পাশের বাড়ীর নীচের কলতলায় ভট্টচাযিয় গিন্নি হাঁক পাড়লেন, একটিমুহূর্তেই আমার সাজানো বাগান তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ভট্টচাযিয় গিন্নীর বাক্যাবলী শ্রবণ করলেই তাঁর চেহারা ও চরিত্র তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে চন্দ্রা, এই আমার বিশ্বাস। তাঁর গলার আওয়াজ শুনলেই আমার মনে হয় তাঁর হাতে শাঁখা, পরণে কস্তাপেড়ে শাড়ী, চুলওঠা মাথায় এতখানি ড্যাবড্যেবে সিঁদুর, দু'পায়ে হাজা ঘা।

বীণানিন্দিত কণ্ঠে তিনি বল্লেন, 'তুলে দাও, ভাঙা পাঁচিলটা তোমরা তুলে দাও বাপু, নৈলে আমি আর এ-বাড়ীতে টেক্‌তে পারিনে, একটা বিলি-ব্যবস্থা তোমরা কর।'

কি হল' গা বৌমা ?'

'কিছুই হয়নি, হবে আবার কি মা ? ছোটপিসিমা কথা তুললেন কিনা তাই ঠাকুরপোকে বলছিলাম, তোমরা পাঁচিল তুলে দাও। আমরা গরীব বলে' কি আমাদের আব্রু নেই ?

এ পাড়ায় এই পাঁচিলটির আলোচনা শোনেনি, এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। হেসে চুপ করে রইলাম। ভাবলাম এবার গল্পটা ধীরে ধীরে আরম্ভ করা যাক্, ওরা পাঁচিলে ততক্ষণ মাথা ঠুকে মরুক্। কিন্তু ভট্টচাযিয়-গিন্নীর কণ্ঠস্বরে আবার আমার কলম কেঁপে উঠল।

তিনি পঞ্চমে উঠে হাঁকলেন, 'তোমাদের আর কি বল, তিন কাল গেচে এক কাল বাকি—আমার হয়েচে যত জ্বালা।'

'তা মা তুমি সোমত্ত মেয়ে·· না হয় একটু রোগা—'

'রোগাই হই আর হাড় ক'খানাই সার হোক্, ছোট-পিসিমাদের দেহ যেমন অসাড় হয়ে গেচে, আমার তা এখনো হয়নি মা। কোন পরপুরুষ তাকালে এখনো আমার গা সির সির করে।—আমি মর্‌তে মা লক্ষবার আনাগোনা করি, সব সময় কি ঠিক থাকি, হয়ত গামছাখানা প'রেই দু'ঘণ্টা রইলাম—নিজের বাড়ীতে আমি যা খুসী তাই করব।'

শ্রোতা ও দর্শকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করে তিনি বল্‌লেন, 'ওমা, যখনই চোখ পড়ে দেখি ও-বাড়ীর বড ছেলেটা ঘুলঘুলি থেকে সরে গেল, ওই যে গো ওদের শৈলেন ··ওকি বদ্‌স্বভাব গা? পরের বো'য়ের দিকে হাঁ করে' তাকানো? কী দেখিস্? আমিও মানুষ তুইও-মানুষ, আমাকে এমন করে' দেখবার কী আছে শুনি?'

কানের ভেতর দিয়ে তাঁহার সঙ্গীত আমার মরমে পশতে লাগ্‌ল। কলমটি রেখে সেইদিকে কান পেতে রইলাম।

তিনি বল্‌তে লাগলেন, 'আর কেউ ত্যাখে না, আর কি ছাই আমারই ওদিকে চোখ পড়ে গা? যত ভাবি দেখুকগে, যা খুসী তাই করুক গেরাজ্যি করব না, তবু ছোঁড়া আমার নজরে পড়ে' যায়, চোখ আমার

অবাধ্য—আমিও বাবা কম মেয়ে নই, আমিও সব খবর রাখি। জান্‌লার ধারে বসে' দাড়ি কামানো হয়, আয়না নিয়ে চুল আঁচ্‌ড়ানো—যেন কতই গম্ভীর! কা'র চোখে তুমি ধূলো দাও শুনি? আমার চোখে? আমি বাবা তোমার নাড়ী-নক্ষত্র জানি। বউটার কা'ছে আবার সাধু সেজে থাকা হয়, এবার বউটাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে একেবারে আউট্‌ হয়ে বসেচেন। এখনকার ছেলেদের এতটুকু বিশ্বাস করো না মা, তারা সব পারে। সব জ্ঞান তাদের আছে, শুধু ধর্ম্মজ্ঞান নেই।'

তাই নাকি? তুমি কি বল চন্দ্রা?

'তোমরা বুঝি ছাখোনি ছোঁড়াকে? দিব্যি রইল, একবার দেখো। দেখো ওর মুখে চোখে কি অহঙ্কার।'

'কেন, অহঙ্কার কেন বৌদি?'

'কেন? সুপুরুষ বলে?' আমার চোখ ভাই বড় ধারালো, ওর মনের কথা পর্য্যন্ত বলে' দিতে পারি। সেদিন কল্‌তলায় আমায় দেখে ঝপাৎ করে' জান্‌লাটা বন্ধ করে' দিল, যেন কতই সাধু। তোমরা জানো না মা, ছোঁড়া বদ্‌মাইসের ধাড়ি, বৌটাকে নিয়ে কি আদিখ্যেতাই করে। বলি দেখিত একদিন ছোঁড়ার কাণ্ড-কারখানা। দেখেছো ত, আমার ঘরের সাম্‌নে ওর ঘর?—জান্‌লাটা বন্ধই থাকতো, সেদিন রাত্তিরে ঘরের আলো নিবিয়ে খুললাম মা জানলাটা—উনি গিয়েছিলেন

যজমান বাড়ী—ওমা কি হবে গো, বৌকে ভালবাসা জানাবার কী ঢঙ? এ যে বেশ্যেবাড়ীর হদ্দ। আমরাও ত ঘরের বৌ মা, কই ওঁরা ত এমন ব্যাভার করেন না,—একটা চক্ষুলজ্জাও নেই গা?'

কে যেন কি একটা প্রতিবাদ করতে গেল, তিনি বলে' উঠলেন, 'থামো ঠাকুরপো, আমার মুখের ওপর ওকালতি করতে এসো না, তোমাকেও আমি চিনি, শৈলেনকেও চিনি। পাড়ায় ত আর মাথা নেই যে এই বেলেল্লাপণাকে টিট করবে, আমাকেই সব সইতে হচ্ছে। —সেদিন দেখি, বুঝলে পিসিমা, হেসে হেসে একখানা চিঠি পড়া হচ্ছে, পেম্ পত্তর যেন আর কেউ পড়ে না, ইচ্ছে করল দিই একঠা গালে চড় বসিয়ে—বেহায়া। কই কেউ বলুক দেখি ওঁর কথা? একটু উনিশ-বিশ কেউ দেখেচে কখনো? এদিকে যেমন গম্ভীর, তেমনি পুজো-পার্ব্বণ নিয়ে দিনরাত থাকেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে কখনো হাসতে দেখিনি, এমন সচ্চরিত্র মানুষ, মানুষ ত নয়, দেবতা। ওঁর কাছে ও? এখনকার ছেলেরা মা হাল্কা, ছটফ ট, একটু রাশভারি নয়, মেয়েমানুষের কথায় ওঠে-বসে, ভালবাসা ছাড়া দুনিয়ায় তাদের আর কোন কাজ নেই। আ মরণ। সেদিন দেখি মা, পাঞ্জাবী উড়িয়ে গলায় চাদর দিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে ফুল্‌বাবু শফরে বেরুচ্ছেন। ইচ্ছে হল পেছন থেকে গিয়ে গলার চাদরখানা পাকিয়ে ছড়ির বাড়ি অম্‌নি সপ্‌াসপ্‌—কি

বলব যে আমি ঘরের বৌ।'

সকলের মুখ দিয়ে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল, খুব সম্ভবতঃ তাঁর অঙ্গভঙ্গী দেখে। কিন্তু আমি হাসলাম অন্য কারণে। তুমি জানো চন্দ্রা সে কারণটা কী?

[redacted] বলছিলেন, [redacted] যদি ভাই বৌছুঁড়ী দেখতে রূপবতী হতো। রাম বল, ওর নাম রূপ? আমাদের মা যতই অভাবের ঘর হোক, খাই আর না খাই, কাঠামোটা দেখলে শত্রুরেও চোখ ফেরাতে পারে না—বড় মুখ করে বলতে পারি আমার চেহারার সঙ্গে ওর বৌ'য়ের—অবিশ্যি বলাটা ভাল দেখায় না তা জানি, ঘেন্নাও করে—'

একজন বর্ষীয়সী বল্‌লেন, 'তাত বটেই বৌমা, সব কথা বলাও যায় না, অথচ মনেও হয়। তোমার এখনো যা চেহারা আছে, যত্ন-আত্তিতে থাক্‌লে—তোমার রূপ ত ছাই চাপা আগুন।'

কলতলায় কাপড় আছড়াতে আছড়াতে ভট্টচায্যি-গিন্নি বল্‌লেন, 'সেই কথাই ত বলচি পিসিমা, ও-ছোঁড়াও সে কথা বোঝে। উনি আমার শিবতুল্য সোয়ামী, তবু বলি, আমি যদি ওই শৈলেনের হাতে পড়তাম তবে দেখতে তোমার, কী জব্দ করতাম। আমার কাছে বাবা ওসব চালাকি চলত না। হোক পরপুরুষ, তবু বলি, আমি চোখ বুজিয়ে ও-ছোঁড়াকে বুঝতে পারি, ও কি কম শয়তান? কত দিন রাতে শুয়ে শুয়ে ভেবেচি, ছোঁড়াকে কি করে' বাগে ফেলা যায়,

কোনো উপায় পাইনি, ইচ্ছে হয় ওর বৌকে বলে' দিয়ে জব্দ করি। তা'পর বলি, না, একটা কিছু কেলেঙ্কারী হবে! এমন ইচ্ছে করে পিসিমা, যে, যাই লুকিয়ে ওর ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আসি, আমার এক একবার অসহ্য হয়ে ওঠে। ওর কথা ভাবলে রাতে আমার ঘুম হয় না। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়েছেন, নৈলে অমন নচ্ছার লোকের পাশে আমাকে দিন কাটাতে হয় কেন? ঠাকুরপো, তোমরা এর একটা বিহিত করো, কিছু একটা করো, নয়ত ছাত পর্য্যন্ত উঁচু একটা পাঁচিল তুলে দাও, কিছু না পারো, চল বাড়ী বিক্রি করে' এদিক থেকে চলে যাই। আমি আর পারিনে, এ আর আমার সয় না, এর পর গলায় দড়ি দিয়ে আমি সব জ্বালা জুড়োবো।'

'বেশ ত বৌদি, আমরা ও বাড়ীর লোকদের ডেকে বলিগে?'

'না, না—বলতে গেলে ওরা বলবে, তোমাদের ঘরের বউকে সাবধান করগে, তখন তোমাদের মুখ থাকবে কোথায়? লুকিয়ে লুকিয়ে ছাখে, তার ত আর প্রমাণ নেই, অথচ তার সব জ্বালা আমার সব অশান্তি আমার। তোমরা কি জানবে আমার হয়েছে কাঁটাবন দিয়ে টানাটানি—'

স্পষ্ট বুঝলাম কান্নায় ভট্‌চাযি্যি-গিন্নীর গলা বুজে এল।

সেদিন সকালের কলরব সেইখানেই শেষ হল কিন্তু আমার গল্প লেখা আর হল না, চন্দ্রা। প্রেমের গল্প বিনিয়ে বিনিয়ে লেখাই

সাহিত্যের একমাত্র বিষয়-বস্তু নয়। ভট্টচার্য্যি-গিন্নীর মত হতভাগিনী মেয়ের আব্রুর কথা শুনতে গিয়ে যদি একটি সকাল প্রেমের গল্প না লিখে নষ্ট করতে হয়, তাতে সাহিত্যের বিশেষ কোনো ক্ষতি নেই, তুমি কি বল?

মনের মানুষ যেবার খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, চন্দ্রা, তখনকার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, শোনো—

চিঠি লিখেছি, টাকা এলেই চলে' যাবো। রুগ্ন হলে বোধ হয় কাছাকাছি শহরের হাসপাতালে আশ্রয় পেতাম কিন্তু শরীরটা সুস্থ থাকার দরুণ ছোট কাফিখানাটি ছাড়া আর কোথাও থাকবার জায়গা পাওয়া গেল না।

ছোট্ট কাফিখানাটি একেবারে সমুদ্রের চড়ার উপর। নারিকেলের খুঁটি, বাল্দো, আর করোগেট্ দিয়ে ঘরখানি তৈরী, তারই অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে অবিশ্রান্ত সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া বইচে, হাসফাঁস করে নিরন্তর একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। আগুন লাগবার ভয় এখানে বড়বেশী, তামাক খেতে গেলে অনেক আইন কানুন মেনে চলতে হয়; উনুনের আঁচটাকে সামলে রাখা একটা মস্তবড় কাজ।

'মানেক'কে অনেক প্রলোভন দেখাতে হয়েচে, কবুল করেচি তার পাওনার চেয়ে অনেক বেশি। লোকটি মন্দ নয়।

সমুদ্রের চড়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে ঢেউয়ের অবিচ্ছিন্ন গর্জ্জন শুন্‌তে শুন্‌তে দিন কাটে। একাকীত্বকে ঘিরে ছোটখাটো একটি জগৎ গড়ে উঠেচে কি আর করি, অদূরে ছোট পাহাড়ের গায়ে যেখানে ঢেউগুলো এসে ভাঙে তারই কোলে গোপন গুহার মধ্যে নিজের কল্পনাকে ছেড়ে দিই, দুতিনটি তারার সঙ্গে বেশ চেনা শোনা হয়ে গেচে, সূর্য্যাস্তের কতক্ষণ পরে তাদের প্রথম দেখা পাওয়া যায় তা বেশ জানি, আকাশ আর সমুদ্রের রঙ্‌ কখন বদলায় তার একটা মোটামুটি হদিস বেশ মনস্থ করেচি। মাঝে মাঝে চড়ার পথ ধরে বহুদূর পর্য্যন্ত চলে যেতাম, বালির পথ সবাইকে প্রলুব্ধ করে দূরে নিয়ে যাবার জন্য। একটুখানি তামাসা করবার লোভে কাফিখানার সঙ্গে মনটাকে বেশ করে বেঁধে নিজেকে আল্‌গা করে দিয়ে হাঁট্‌তে সুরু করতাম। হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বহুদূর গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে পথটাকে ফাঁকি দিয়ে হেসে ছুটে পালিয়ে আসতাম। বালির পথ, চলতে ভারি অসুবিধা হতো—তা হোক, পিছন দিকে আসন্ন সন্ধ্যার একাকিনী নিরুদ্দেশ অন্ধকারের মিনতিকে এড়াতে পারলে বাঁচ্‌তাম। সে যেন পথ ভোলাতো।

কাছেই ছোট বন্দর। নাম ওখা। সপ্তাহে চারদিন করে' জাহাজ যাতায়াত করে। কোশখানেক দূরে ত্রিশূলীর একটা মন্দিরকে কেন্দ্র করে ছোট একটি শহর। সে খানেই হাট-বাজার-লোকালয়।

জাহাজ জেঠিতে এসে ভিড়লেই কাফিখানায় শ্রমিকদের জটলা হয়। খালাসীর সংখ্যাই বেশি। তা ছাড়া কেউ বা টিকিট-চেকার! জন দুই পুলিশের লোক, তার মধ্যে একজন আবার গোয়েন্দা

জাহাজে যারা কাজ করে তারা নিজ নিজ জীবনের স্মৃতিকথা আওড়াতে পারলে আর কিছু চায় না। এই বোধ হয় নিয়ম। কারণ, প্রায়ই দেখেচি জলের উপর যারা ভ্রমণ করে তারা জাহাজ যেদিকে চলচে তার উল্‌টো দিকে তাকিয়ে থেকেই সময় কাটায়। যাই হোক, অনর্গল উচ্ছৃঙ্খল আত্মকাহিনী শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। নিতান্ত করুণাপ্রার্থীর মত এক পাশে বসে' বসে' তাদের দিকে চেয়ে থাকা ভিন্ন আর কোন কাজ ছিল না। বারণ করতে গেলে হয়ত বা মারতেই উঠবে—তাদের বিরাট দেহগুলির দিকে তাকালে এই কথাই মনে হয়।

আত্মকাহিনীর প্রতিযোগীতায় সবাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে।—

—সাত বরিষ্ জাহাজ্‌সে উতরনেকো হুকম্ হমারে নহি থি। সমঝে ?

নানক সিং মাথার পাগ্‌ড়িটা একবার ঠিক করে' নিল, তার পর ভাটার মত চোখদুটো একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বল্‌ল—সাত বছর ? কিচ্ছু না। আঠারো থেকে উনত্রিশ বছর পর্য্যন্ত আমার হাতের শেকল

খোলা হয় নি। ছোট একটা 'লেডকার্টকে ছাদের ওপর থেকে 'তালাও'য়ের মধ্যে ছুড়ে ফেলেছিলাম। কেঁউ, ভাই হাজারিলাল, খেয়াল হৈঁ?

হাজারিলাল গাঁজার কল্‌কেটা আর একজনের হাতে দিয়ে বল্‌ল—রাজকোটের ডাকাতিটা বাদ দিচ্ছ কেন? ম্যায় গয়ে থে তুমারে সাথ,—অ্যা জি?

—জি হাঁ। বলে নানক সিং একটু হাসলো অর্থাৎ সেই অদ্ভুত ডাকাতির গল্প শোনবার উপযুক্ত লোক এখানে কেউ নেই।

মোহনদাস এতক্ষণ বসে বসে গোঁফ আর দাড়ির জঙ্গলে হাত বুলোচ্ছিল, এবার হঠাৎ নিজের পায়ের উপর সজোরে একটা চাপড় মেরে বল্‌ল—আরে 'লুঠতরাজ' ত ছোট কথা। পৈরাগকুমারীকে কেটে দুখানা করে' এলাম তবু আমার ফাঁসী হল না। জান ত সে কথা?

সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'... ছাংলা পল্লির' পাহাড়ে পল্টনের দপ্তর ছিল তোমরা জান না। 'সাহাব লোগ'-এর একটা কবরের জমিন্ ছিল অনেক নীচে। আমি সেই কবরের মাটি খোঁড়ার কাজ করতাম।

হাঁ, সেখানেই পৈরাগকুমারীকে দেখলাম। চমৎকার মেয়ে, কাট কেটে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করত। ভাব হল, ভারি আরামে রইলাম

দুজনে অনেক দিন পর্য্যন্ত, তার পর জানত' মানুষের কপাল? একটা 'সাহাব' জুটে গেল, মেয়েটাকে আর তার মাকে অনেক টাকা ঘুস খাওয়ালো। আমি গরীব লোক, টাকা অত পাবো কোথায়। সেখানকার জল হাওয়ার গুণে লোকে কম মরত, মাইনেও অল্প, বক্শিশও পেতাম না। ভারি রাগ হ'ল। একদিন চাঁদের আলোয় দুজনকে জঙ্গলের মধ্যে দেখে...উঃ গায়ের রক্ত অমনি পিল্ পিল্ করে' উঠল। নিজকে আর কি তখন সাম্লাতে পারি? হাতে ছিল কোদালি, আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে মেয়েটার গলার ওপর বসিয়ে দিলাম। বাস্ দু মিনিটের মধ্যেই খতম্!

মোহন দাস হাসতে লাগল। সবাই বলল—তারপর? তারপর?

—তারপর কত কাণ্ড হয়ে গেল। আসল ঘটনা হচ্ছে ওইটে! তবে বাজার দয়াতে দ্বীপান্তর থেকে অনেক দিন পর খালাস পেয়ে এলাম।

আপন আপন অপরাধের ইতিহাস অকপটে বলতে তাদের কারো লজ্জা ছিল না, শাস্তি তাদের হয়ে গেচে। চুপ করেই শুনতাম, কিন্তু আবহাওয়াটা কেমন যেন ভয়াবহ হয়ে উঠত।

সকাল আর সন্ধ্যায় লোকের অতিরিক্ত ভিড়। পিতলের ছোট গামলা আর গেলাসে ঢালাঢালি করে' সকলের কাফি পান করা চলত। রাত্রে আবার সবাই জাহাজে ফিরে যায়।

—ঠাকুরজিকা কেয়া হাল্‌চাল্ দেওয়ান চন্দ্‌?

সবাই মুখ ফিরিয়ে তাকায়। কলঙ্ক-কাহিনীর বিবৃতির মাঝখানে ঠাকুরজীর কথায় দু একজন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

দেওয়ান চাঁদ সশ্রদ্ধভাবে বল্‌ল—ওই একটি মানুষ, সারা দুনিয়ামে এ্যায়সা চাঙ্‌গা আদমি কভি দেখা নেই যায়েগা। এমন আশ্চর্য্য 'সন্নিয়াসী' কখনও দেখিনি। কাছে গেলে আপনা হতে পায়ে মাথা লুটিয়ে পড়ে,—সাচ্‌ বল্‌তি ম্যায়।

—কোথায় তিনি?—সবাই ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

—মন্দিরে তাঁর রামায়ণ-গান হচ্ছে, কাল শুনতে গিয়েছিলাম।

বল্‌তে বল্‌তে সরল ভক্তি ভরে ঠাকুরজীর উদ্দেশ্যে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে দেওয়ান চাঁদ একটি নমস্কার জানায়।

অবাক হয়ে খানিকক্ষণ সবাই তার দিকেতাকায়। হঠাৎ মনে হতে পারে অন্ধকার পাথার-পুরীর ক্লেদাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে দেওয়ান চাঁদ যেন আলোকের একটি স্নিগ্ধ উজ্জল রেখা বহন করে' এনেচে। যে মানুষের পায়ে মাথা লুটিয়ে পড়ে সে মানুষ কেমন, কী আছে তার চোখে যে—

নানক সিং একটু নড়ে চড়ে বল্‌ল্—একবার দেখা পাইনে তাঁর?

হাজারিলাল পর্য্যন্ত একটি নিশ্বাস ফেলে দেওয়ান চাঁদের দিকে তাকাল।

পুরুষোত্তম এতক্ষণ একপাশেই বসেছিল, হঠাৎ একটা ঝাকানি দিয়ে বল্ল—আরে থামো থামো, কোথাকার কে তার ঠিক নেই। ওরকম সন্ন্যাসী অনেক দেখেচি। তবে শোনো বলি গোড়া থেকে। গলা ঝাড়া দিয়ে ঠিক হয়ে বসে পুরুষোত্তম বলতে লাগল-তেরো বছর বয়সে আমি প্রথম পুলিশে ধরা পড়ি, হষ্টিশানে একটা বাবুর পকেট থেকে একটা আধুলি তুলে নিতে গিয়ে ছ'মাস শ্বশুরবাড়ী ঘুরে এলাম। ছ'মাস পরে ফিরে এসে একদিন পথ দিয়ে হাঁটছি, পুলিশের দুটো লোক এসে আমার ট্যাকের ভেতর থেকে এক জোড়া সোণার বালা বার করল। আবার ছ মাস। হা ভাগবান!

তার বলা ভঙ্গী দেখে সবাই হেসে উঠল।

—শোনো বলি শোনো, হেসো না…দুটো মেয়েমানুষ নিয়ে একবার পালাচ্ছিলাম, তাদের সোজা পথ দেখানোর লোভ দেখিয়ে,—হাঁ, তারা 'তীরথ' করতে বেরিয়েছিল,—বানাস্ নদী পার হয়ে সেই-যে আবু পাহাড়ের নীচে জঙ্গল, সেই জঙ্গলের মধ্যে আছে হৃষিকেশের মন্দির। ……দিনের বেলাও সেখানে অন্ধকার, মেয়েমানুষ দুটোর কাছে অনেক টাকা ছিল, একজন ছিল ভারি সুন্দরী!

রূপলাল ব্যাকুল ব্যগ্রতায় বল্ল—তারপর? তাড়াতাড়ি বল্।

পুরুষোত্তম একবার মাথা হেঁট করল, কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলে বল্ল—হাঁ বলবই সেই সন্ন্যাসীর ওপর আমার রাগ আছে।……রাতের

বেলা সেই সুন্দরী মেয়েটার কাছে বসে' কি জানি কেন আমি হাউ হাউ করে কাঁদলাম, আর কেউ ছিল না সেখানে। একেবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম।

—কেন ? কাঁদ্‌লি কেন ?

—তা জানি না ভাই, মেয়েটাকে আমার ভাবি ভাল লেগেছিল, সে যদি আমার সঙ্গে আসত আমি চুরি করা ছেড়ে দিতাম, তাকে নিয়ে ঘর করতাম,……হাঁ, তারপর ভুলে যাচ্ছি, মেয়ে দুটো গোলমাল করে' উঠল, এক বেটা সন্ন্যাসী ছুটে এসে সব শুনে বল্‌ল, আমি নাকি সুবিধে পেয়ে লুকিয়ে মেয়েটাকে অপমান করতে গিছলাম। রাগ হয়ে গেল ……আমি কাঁদতে পারি, ভালবাসার কথা বলতে পারি, তাই বলে' কি কাপুরুষের মতন মেয়েমানুষকে একলা পেয়ে……মারলাম একটা পাথর ছুড়ে সন্ন্যাসীর মাথায়, মাথাটা ফেটে গেল। তারপর নিজেই আমি পুলিশে ধরা দিলাম, মেয়ে দুটো গিয়ে কাছারীতে আমার নামে যা তা বল্‌ল।—হাসতে হাসতে পুরুষোত্তম বল্‌ল—আবার দশ বছর ধরে' পাথর ভাঙতে গেলাম। বুঝলে, কেন 'সন্নিয়াসীর ওপর আমার রাগ ?……

পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঝড়ো হাওয়া বইচে। বালির পথ ভেঙে একটা লোক মোট মাথায় নিয়ে শহরের

দিকে চলেচে। ঢেউ যেখানে এসে আছড়ে পড়ে' মাথা ভাঙাভাঙি করচে তারই কাছে এগিয়ে গেলাম। কোনো একটা কাজ করবার জন্য হাত-পা নিস্‌পিস্‌ করচে। দিনের পর দিন কোনো কাজ নেই... এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি আছে? খাম-খেয়ালির মত বালির গাতার উপর দিয়ে কয়েক পা ছুটে গেলাম, পরক্ষণে বড় বড় তরঙ্গ এসে পায়ের দাগগুলি মুছে নিয়ে গেল। কতক্ষণে অন্ধকার হয়ে আসবে, কতক্ষণে সেই তারা দুটি আকাশে দেখা দেবে তারই কথা ভাবচি।

আবার উঠে খানিকদূর এগিয়ে গেলাম। জলের উপর পশ্চিমের সূর্য্যটা ঝুঁকে পড়েচে। বেশি দূরে নয়, এই কাছেই। মাথা কাৎ করে জলের উপর দিয়ে দেখলে হাত দশেক দূরেই মনে হবে সূর্য্যাস্তের এত কাছে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। জলের উপর দিয়ে রশ্মিটা ভেসে এসে আমারই ঠোঁটের কাছে লাগ্‌চে। হাতের অঞ্জলির মধ্যে রশ্মিটুকু নিয়ে চুম্বন করলাম। ভারি মিষ্টি আলো।

একাকী সাগরের তীরে পায়চারি করতে কেমন যেন একটি যন্ত্রণাদায়ক তৃপ্তি বোধ করছিলাম। পূর্ব্ব-দিগন্তে ধাবমান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে একবার চারিদিক দেখলাম। সমুদ্রের দীর্ঘ বেলাভূমিটা নীলাম্বরীর আগায় জরির পাড়ের মত দেখাচ্ছিল।

হাঁ, খেয়াল ছিল না এতক্ষণ, আকাশে আকাশে দীপালী জ্বলে উঠেচে। আমার সে প্রিয় দুটি নক্ষত্রকে খুঁজে বার করে' একবার অভিনন্দিত করলাম। ভয়-ভীষণ সাগরের দিকে তাকিয়ে মনে হল আজ বুঝি অমাবস্যার কোটাল।

বিশ্বপ্রকৃতি অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিয়েচে। অনেক দূরে এসে পড়েচি। পিছন দিকে একবার তাকাতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ প্রবল শক্তিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগলাম কাফিখানাটা লক্ষ্য করে'।

আরো দুটি দিন পার হয়ে গেল।

মালেকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে। মানুষের অনুগ্রহের উপর আর কতদিন সুবিধা নেওয়া চলে? তাকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য কাফিখানায় বিনা মাহিনাতেই ঝাড়ুদারের কাজটা নিলাম। চন্দ্রা, তুমি বিস্মিত হয়ো না।

কাজটা মন্দ নয়, বেশ ফাঁকি দেওয়া চলে। দুবেলা মাত্র দুঘণ্টা এর উপর যদি ভিড়ের মধ্যে সবাইকে কাফির গেলাস হাতে হাতে এগিয়ে দেবার কাজটা করি তাহলেও সময়টা বেশ আনন্দেই কাটবে।

জাহাজ আবার এসে জেঠিতে ভিড়েচে। পশ্চিম দিকে সূর্য্য হেল্‌তে না হেল্‌তেই কাফিখানায় লোক জমায়েৎ হচ্ছে। এই

মধ্যে আবার অনাদৃত জীবনের ছোট ছোট কাহিনী সুরু হয়ে গিয়েছিল। এদের আলোচনাগুলি বেশ লাগচে। পাপের কলঙ্ক এরা ঢেকে রাখে না, সৎকর্ম্মকেও এরা অতি-বিনয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে না।

কাফি সরববাহ কচ্ছিলাম। তুড়ি দিয়ে গুর্জ্জব সিং কাছে ডাক্‌লো। নিকটে যেতেই আমার মাথাটা ধরে ঝাকানি দিয়ে একটু আদর করল। সামান্য একটু স্নেহের আভাস পেলাম। বলল-- ঠাকুরজির গান হবে এখুনি। শুনবে ত?

ঠাকুরজি কই? সেই সন্ন্যাসী?

সবার চক্ষু যে মানুষটির উপর গিয়ে পড়ল, তিনি এতক্ষণ একান্তে বসেছিলেন। কপালে তাঁর শ্বেত চন্দন, মাথায় সাদা পাগড়ি, পরণে খদ্দর, হাতের কব্জিতে রুদ্রাক্ষ বাঁধা,—মুখে একটি সুস্নিগ্ধ হাসি লেগে রয়েছে। উদাস আনন্দে দুটি গভীর চক্ষু তুলে বললেন—বাচ্ছা, জীতা রহো!

কাফি পানের পর সবাই পয়সা চুকিয়ে দিল। এবার গান আরম্ভ হবে। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি একবার সবার দিকে তাকিয়ে সস্নেহ হাসি হেসে এই কথাই বুঝিয়ে বল্‌লেন, মানুষ নিজের কাজের জন্য দায়ি হতে পারে না।

সামান্য এই একটি কথায় সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। এ কথা তো তারা কোনদিন শোনেনি। মনে হ'ল এ-মানুষটি যেন কতকগুলি ব্যর্থ উপেক্ষিত জীবনের মাঝখানে একটি নতুন বার্ত্তা এনেচেন। নানক সিং নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। হাজারিলালের হাতে গাঁজার কল্‌কেটা পুড়ে' যেতে লাগল। পুরষোত্তমের কুঞ্চিত ললাট মসৃণ হয়ে এল! এ মানুষটি কি জীবনের গভীরতম সুর বাজাতে পারে?

ভিতরে যেন সকলের নিশ্বাস রোধ হয়ে এসেছিল।

ঠাকুরজী তাঁর স্বাভাবিক উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—আমার নিজের একটি ঘটনা শুন্‌লে তোমরা বুঝবে যে আমাদের কোন হাত নেই নিজেদের ওপর।

সবাই আগ্রহে আকুল হয়ে উঠ্‌ল।

.. বয়স তখন অল্প, ছটা রিপুকে তখনও আয়ত্ব করতে পারিনি, এমন একদিন একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম,—সেও আমাকে,—কিন্তু যাক্ সে কথা। সে সময় বড় দরিদ্র ছিলাম, মেয়েটার মুখে খাবার দিতে পারতাম্ না। নিরুপায় হয়ে কতদিন চোখের জল ফেলেচি। একদিন করলাম কি—

—কি? কি করলেন?

—কি করলাম?—ঠাকুরজি হেসে বললেন—মানুষ অবস্থার দাস



মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্য অন্ধ হয়ে গেলাম, তখন কি মনে হয়েছিল যে বাঁচাবার কর্ত্তা আমি নই ?

—কি করলেন ?

—না বলে' এক বন্ধুর বাক্স থেকে টাকা তুলে' আন্‌লাম।

—চুরি ? চুরি করেচ তুমি ?

গুর্জ্জর সিং আর হাজাবিলাল ঝড়ের মত হা হা করে হেসে উঠ্‌ল। শুনলে ভাই শুনলে ? ঠাকুরজিও আমাদের চেয়েকম যায় না।—একটি মুহূর্ত্তে যেন প্রকাণ্ড একটা ভোজবাজী হয়ে গেল। দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে নানক সিং বল্‌ল—চোর হয়ে তুমি এখানে সাধুগিরি ফলাতে এসেচ ?

ঘৃণিতকণ্ঠে একজন বল্‌ল—তবে আমাদের সঙ্গে তোমার তফাৎটা কোথায় রইল হে ঠাকুর ?

করযোড়ে ঠাকুরজি বললেন—বেটা, আমি নিজেকে সাধু বল্‌চি না, ধার্ম্মিক বলে' আমার অহঙ্কার নেই, আমি তোমাদেরই মতন, তোমাদেরই ভাই আমি। আমি কেবল বোঝাচ্ছিলাম যে—

তখন কে কার কথা শোনে। সমস্ত দোকান ঘিরে একটা হল্লা উঠ্‌ল। বাইরের কতকগুলি লোক এসেছিল, তাদের নানাজাতীয় বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তিতে ভিতরটা বোঝাই হয়ে উঠ্‌ল।

ঠাকুরজীর প্রতি সকলের এত শ্রদ্ধা, এত হৃদয়াবেগ এক মুহূর্ত্তে ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গেল। বহুকাল পূর্ব্বের সামান্য কোন নিরুপায় অন্যায়ের জন্য একটি পরিণত তপঃসিদ্ধ জীবনকে তারা বিদ্রূপ করে' মিথ্যা বলে' উড়িয়ে দিল।

ঠাকুরজী হাত জোড় করে' দাঁড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছিলেন কিন্তু তাদের কঠিন মন টল্‌ল না। বল্‌ল—চোট্টা, ডাকু কাঁহেকা।

একজন বল্‌ল—মন্দিরে তোমার ভণ্ডামীর জায়গা ছিল, তা বলে এখানেও আমাদের কাছে চালাকী করতে এসেচ ?

মনে হচ্ছিল, হিংস্র দাঁত দিয়ে সবাই বুঝি এখুনি ঠাকুরজীকে ছিঁড়ে খাবে।

দিশেহারা হয়ে গেলাম। ঠাকুরজীর দিকে একবার তাকিয়ে টল্‌তে টলতে বাইরে এসে লক্ষ্যহীন হয়ে একদিকে ছুটে চললাম।

ছুটে চললাম—ছুটে—ছুটে—রুদ্ধ নিশ্বাসে তীব্রবেগে চললাম

নীল পাখী উড়ে চলে গেল অনন্ত বেলাভূমির উপর দিয়ে। নির্জ্জন সাগর-তীরে এলাম। দীর্ঘ জিহ্বা মেলে দিয়ে অজগর সাপটা তৃষ্ণায় শিউরে শিউরে উঠ্‌চে। টিক্ টিক্ করচে চন্‌চনে রোদ। তরঙ্গের এ ব্যাকুলতা কেন? থানাও তোমার কান্না। অবিশ্রান্ত মর্ম্মান্তু আর্ত্তনাদ আর সহ্য হয় না।

হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবলাম কী করি। কিছু একটা করতেই হবে। অস্থির আবেগে হাত পা কাঁপচে। মাথা ঠুকে ঠুকে নিজেকে রক্তাক্ত করলেও বাঁচতাম, রক্ত দেখে শান্তি পেতাম।

—বাচ্ছা, উঠো।

মানুষের আওয়াজ পেয়ে চমকে চট করে উঠে বসলাম। চোখের জলের সঙ্গে সমস্ত মুখে আমার বালি মাখামাখি হয়ে গেচে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম—ঠাকুরজি?

স্নেহের স্নিগ্ধ নির্মল হাসি তাঁর মুখে জড়ানো। পাগড়ি আর মাথায় নেই। বড় বড় মাথার চুল ঘাড়ের কাছে নেমে এসেচে। চোখ দুটি উজ্জ্বল।

ঠাকুরজি, তোমার গায়ে অত কালশিরার দাগ কেন?

ঠাকুরজী আবার হাসলেন। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—বেটা, তোমার কোন দুঃখ আছে?

দুঃখ? কই না, কিছুই না।

এখানে তবে কি হচ্ছিল বেটা?

—খুঁজছিলাম ঠাকুরজি, একটা জিনিষ আমার হারিয়েচে—আচ্ছা খুঁজে পাচ্ছি না কেন বলতে পারো? সামান্য জিনিষ তবু সেটা আমার চাই যে!

আমার জর্জ্জরিত ক্লিষ্ট শ্রান্ত দেহের প্রতি তাকিয়ে প্রথমে তিনি কথা বললেন না। পরে যাবার আগে প্রণাম করতেই হাত বাড়িয়ে আশীর্ব্বাদ করে' বলে' গেলেন, মন দিয়ে খোঁজ্ বাচ্ছা।

চন্দ্রা, সেই খোঁজাখুজি আমার আজো শেষ হয়নি।

শোন চন্দ্রা, এবার এমন একটি মানুষের কথা তোমাকে বলব যাকে তুমি অনুভব করবে কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে তাকে বুঝতে পারবে না। যাদের আমি আজো বুঝতে পারিনি, কেন জানিনে, তাদের কথাই তোমাকে বলতে আমার ভাল লাগে।

কদাচিৎ পথেই দুজনের দেখা হতো। শীতের রাতে জনহীন পথের প্রান্তে অমনি বেয়াকুবের মত একাকী তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ একটু বিস্মিত হয়ে যেতাম। অনেক কালের চেনাশুনো, কিন্তু বছরে মাত্র তিন চার বার কোনো কোনো বিচিত্র স্থানে এবং নিতান্ত অসময়েই তার দেখা পাওয়া যেত। তার সম্বন্ধে মনে করবার অনেক কিছুই ছিল। হাটের কোলাহলের মধ্যে তার ঠাঁই ছিল না, জীবন-প্রবাহের অবিশ্রান্ত ধারার সঙ্গে সে ভেসে যেত না—সে ছিল অসময়ের মানুষ। তালের সঙ্গে তাল মিশিয়ে চলবার লোক সে নয়, সময়ানুবর্ত্তিতা তার জীবনে কোনদিন ঘটেনি। যে-কোন গৃহস্থ লোকের সে ছিল দু চোখের বিষ।

—তারপর? কেমন আছ হে?

প্রশ্নের জবাব সে সহজে দিত না। দুনিয়ার যে-কোনো লোকের যে-কোনো সাগ্রহ প্রশ্নই তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। উত্যক্ত হয়ে কতদিন চলে গেছি, সে একবার ফিরেও ডাকেনি। প্রকৃতিগত তার একটি অবহেলা সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকলে, আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করে, আকাশের দিকে একবার চেয়ে, নিঃশব্দে একটুখানি হেসে, মাথার চাঁদিটা একবার চুলকে নিয়ে সংক্ষেপে তাচ্ছিল্য কণ্ঠে জবাব দিত—বাঃ।

অথচ পাগল নয়। শীর্ণ একখানি তালপাতার মত দেহ; শীর্ণতর রক্তহীন চির-উপবাসী একখানি মুখ, কোটর প্রবিষ্ট দুটি বড় বড় সহজ দৃষ্টি, খাঁড়ার মত নাক, দাঁড়ি-গোঁফের নিতান্তই অনুর্ব্বরতা, বড় বড় দাঁতগুলি বুজে সলজ্জভাবে আর একবার হেসে বলত—বেশ তুমি লোক যাহোক।

কথার মধ্যে তার মাথামুণ্ড থাক্ আর নাই থাক্ কিন্তু বেশ বুঝতাম রাস্তা-ঘাটের প্রত্যেকটি তুচ্ছতম বস্তুর প্রতি তার একটি সজাগ দৃষ্টি সকল সময়েই খোলা রয়েচে। বহুকাল আগে থেকে তাকে নানা ভাবেই দেখে আসচি, ঠিক কথাটি বলবার আগে বহুদূর পথের দিকে সে একবার তাকিয়ে নেয়—একটি সাগ্রহ প্রতীক্ষা তার সে-দৃষ্টিতে ফুটে উঠতো, অথচ এটি তার অভ্যাস ছাড়া যে আর কিছু তা মনেই হত না।

কি একটা ঔষধের দোকানে পঁচিশ টাকা বেতন নিয়ে সে খা

লিখত। এখনও লেখে। কাজও বাড়েনি, মাইনেও বাড়েনি। কাজের লোক সে নয়, কিন্তু কাজের লোক তার বড় প্রিয়। কায়োকে তাড়াতাড়ি রাস্তা দিয়ে ছুটে চল্‌তে দেখলে সে ভারি খুসি হয়ে উঠত।

বললাম—উজবুকের মত এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে ঘরে গেলেই ত হয়। এই শীতে ঠাণ্ডায় ··

বলল—ঘুম পাবে কখন্ তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, তখন দেখবে পা দুটো ঠিক টেনে নিয়ে যাবে ঘরের দিকে।

অভাব, অনটন, দারিদ্র্য,—তার উপর কয়েকটি অপোগণ্ড ভাই-বোনের ভার তাকে বইতে হতো। ভার যে সে বইচে এ চেতনা তার ছিল না। আজ পর্য্যন্ত যতবার তাকে দেখেছি ঠিক একই ছাঁট-কাটের এবং একই রঙের জামা-কাপড় তার গায়ে ঝোলানো। শাদা রঙ ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো রঙই তার পছন্দ নয়।

ব্যক্তিগত চর্চ্চা এবং বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় আলোচনা তার সইতো না। সব চেয়ে বিস্মিত হতাম, নিজ অবস্থার প্রতি তার একটি সহজ ঔদাসীন্য দেখে। পথ চলতে চলতে ক্রমশঃ সে কথা বলতে সুরু করে দিত—

ভাল হয়নি, মানুষকে এমন করে অপমান করবার চেষ্টা ভাল নয়। দেখলে ট্রট্‌স্কির ইংলণ্ডে আসার সম্বন্ধে বার্কেনহেড আর উইন্‌টারটনের মতামত কি বিশ্রী ?

হঠাৎ একটি উৎফুল্ল হাসি হেসে আবার বলল—কিন্তু বার্ণার্ড শ জবাবটি দিলেন চমৎকার। আমি হলে ঠিক ওই কথাই বলতাম।

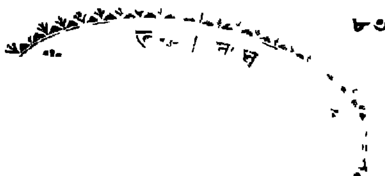
নিঃশব্দেই তার কথা শুনে যেতাম। একটা থেকে আর একটায় টপ্‌কে টপ্‌কে গিয়ে সে যে কোথায় দাঁড়াবে তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই।

—আফগানিস্থানের চেহারা কি রকম বদ্‌লে গেল দেখচ ত? আগে কিন্তু নাদির খাঁকে এ রকম লোক বলে ত আমার মনে হয়নি। আমান্‌উল্লার জন্য সত্যই আমার মন কেমন করে।

তারপর সমাজ, শিক্ষা, সভ্যতা, যন্ত্র-জগৎ প্রভৃতি বড় বড় তত্ত্বের উপর তার আলোচনা সামান্য একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে থাকে।

স্মৃতিশক্তি তার একটু ধারালোই বলতে হবে। ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারি চাকরীতে কে কত বেতন পায়, কার কতদূর উন্নতি-অবনতি ঘটেচে, কে কতদিন পেন্‌সন পাচ্ছে, কে-কে ছুটিতে রয়েচে—ইত্যাদি সমস্ত তথ্যই তার মুখস্থ থাকতো। এর জন্য পুস্তকাগারে গিয়ে সে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে দ্বিধা করতো না।

একা থাকাই হচ্ছে তার জীবনে সব চেয়ে বড় কথা। এ যে তার শুধুই সঙ্গীহীনতা তা নয় তার অন্তর-জগতে মানুষ ত মানুষ—পাখ্‌-পক্ষীর স্থান পর্য্যন্ত সেখানে কোথাও ছিল না। দোকানে কোন লোকের সঙ্গে তার খাপ খেতো না কারণ অন্য কারোকে মানিয়ে



নিতে গেল যে নিজেকেও কিছু ছাড়তে হয় একথা সে জানতই না। দোকানে যেখানে কাজ করে সেই টুলের পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম। খাতা সুমুখে রেখে এক মনে সে কাজ করতো কিম্বা একান্তমনে সে কিছু চিন্তা করতো তা বোঝাই যেত না।

স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার মত হৃদয়ের বালাই তার নেই। মুখ তুলে বলত—কিছুই হচ্ছে না। বেলা দশটায় আসি রাত দশটায় নে যাই—কেবল ফাঁকি দিয়ে। কাজের সময় এদের আরো কিছু াড়িয়ে দেওয়া উচিত—আর শুনেচ, কাশ্মীরে বরফের নদী কত গ্রাম াসিয়ে নিয়ে গেল ?

সব চেয়ে খুসী হতাম যখন সে নিরাশ্রয়ের মত রাস্তার ধারে বসে ম্ভীর উপদেশ দিত।

—এ রকম ভাল নয়—বুঝলে ? ভবিষ্যত জীবনে আমাদের বাইকেই উন্নতি করতে হবে। ভাল দেখে একটা চাকুরি কোথাও থকে বাগিয়ে নাও দেখি ?—না না, বিদেশে কোথাও নয়, এই ল্কাতায়। আর হ্যাঁ, সায়েবের আফিসে কাজ নিও, ও বেটাদের তই গাল দিই কিন্তু কাজের বেলায় ওরা——ইংরিজি কথা বলতে ান ত ? গিয়েই অমনি কপালে হাত ঠুকে গুড্ মড্ নিঙ বলে দাঁড়াবে, ারপর একটু হেসে—

পরম তৃপ্তিতে চক্ষু ঢুলু ঢুলু করে নিজেই সে আবার বল্ল—

সায়েবের সঙ্গে কথা বল্‌চি একথা ভাবতেও আমার ভাল লাগে।

এ সকল কথা শোনার সম্বন্ধে শ্রোতার ঔৎসুক্যের অভাব সে গ্রাহ্যই করতো না। মানুষের মনের কথা জান্‌বার ব্যাকুলতা তার কোনোদিনই নেই।

দৈহিক দুর্ব্বলতা, নিরুৎসাহ, উপায়হীনতা, বাহিরের প্রতিকূলতা— এ গুলিকে সে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে চল্‌তে চায়। ইচ্ছা থাকলেই যে উপায় হয় এ কথা তার চেয়ে বেশি বোধ হয় আর কেউ বুঝত না।

—তবে চুপ করে আছ কেন, এত যদি জানো তবে ভাল করে কাজে নামলেই ত হয়।

বললেই সে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলত। কাজে সে কেন নামে ন কাজের প্রেরণা তার কেন জাগে না, জীবনের এতগুলি উচ্চাশাকে সে কেন মূর্ত্তি দেবার চেষ্টা করে না তা তার অন্তর্য্যামীই জানেন। এ এক একটি দিন তার ব্যর্থ হয়ে চলে যায় সে তাই গুণে গুণে হিসাব করে। *

দেহে যে তার একটি যৌবন আছে সেদিকে তার এতটুকু লক্ষ ছিল না। দৈহিক যৌবনের প্রতি না-ছিল তার কোনো অনুরাগ না ছিল তার সঙ্গে কোনো পরিচয়। অতটা তলিয়ে বোঝবার মত ক্ষ তার দেখা যেত না।

—বিয়ে করবার বয়স যে এসে আবার চলে যাচ্ছে, কতদূর কি করলে ?

ও—বলে মুখ তুলে একবার সে চেয়ে দেখত। বল্‌ত-মনে আছে, ভুলিনি, বিয়ে করবার কথা ভুলিনি কোনোদিন।

বেশ ত, কবে হচ্ছে বিয়েটা।

তা একদিন হবে বৈ কি,—বলে সে আবার মাথাটা কাৎ করে চোখ বুজে নিঃশব্দে কি ভাবতো কে জানে।

চোখ বুজে নিজেকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখবার একটি অভ্যাস তার বরাবরই ছিল। লোকজন কমে গেলে কোনো একটা সাধারন বাগানে ঢুকে জলের কাছাকাছি গিয়ে বসে হাঁটুর উপর মাথা হেলিয়ে সে চোখের পাতা বন্ধ করে থাকৃত। ঘন ঘন জায়গা বদল করার প্রকৃতি তার নয়, একটি বিশেষ স্থানই ছিল তার সব চেয়ে প্রিয়। বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা তার কোনদিনই দেখা যায়নি।

এমন জীবনের অর্থ কিছু বোঝা যায়, চন্দ্রা ?

নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে একদিন অকস্মাৎ কি একটা কথা উঠেছিল, অনধিকার চর্চ্চা হিসেবে সে প্রথমে চুপ করেই ছিল।

এক সময় বল্‌ল—আচ্ছা প্রেম মানে ভালবাসা, কি বল ?

তা এক রকম বলতে হবে বৈ কি, কেন বলত ?

না তাই বলচি। তাই যদি হয় তা হলে ভালবাসা মানে প্রেম

ছাড়া আর কি হতে পারে ?

বাস্—ওই পর্য্যন্তই। ভালবাসা মানে প্রেম না হলেও তার কিছু যায় আসে না। একটা হাই তুলে একটুখানি হেসে সে বলে—মেয়ে মানুষের কোনো কথা আমার ভাল লাগে না।

ভাল তার কিছুই লাগে না। সমাজ, সংসার, জীবনযাত্রা, আনন্দ, বেদনা—কিছুই তাকে চঞ্চল করে তোলে না। তার হৃদয়ের কঠোরতাও দেখা যায়নি, কোমলতার সন্ধানও কোনোদিন মেলেনি, অসচ্চরিত্র সে নয়, কিন্তু চরিত্রের মৌলিকতাও তাব কিছু ছিল না। সংসারকে সে যেন একটি পবম অহঙ্কারে নিজের কাছে বাতিল করে দিয়েচে। মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে নিতান্ত অবজ্ঞাভরে তাই বলে—কিছু হচ্ছে না —বুঝলে ? এই যা দেখচ এসব কিছু হচ্ছে না।

পৃথিবীর বড বড লোকেরা তার পরামর্শ নিয়ে যদি কাজকর্ম্ম কবতো, তাহলে হয়ত কিছু হতে পারতো—এমনি একটা মনোভাব তার মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতাম। লোক-সমাজে মুখ বুজে বাস করে' সে যেন সবাইকে অনুগৃহীত করেচে। নিজেকে বোধ করি এইদিক দিয়ে ভয়ানক শ্রদ্ধা করতে গিয়ে অন্য সবাই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

শান্ত লোক বলতে কিন্তু তাকেই ঠিক বোঝাত। কোথাও আগুন লেগেচে শুনে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে উদাসীনের মত বসে থাকতো।

কেউ আত্মহত্যা করেছে শুনলে সে একটুখানি হেসে বলত—ছেলেমানুষ। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যাবেলায় সে একান্তে কোথাও শুয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেত।

একদিন শুধু তাকে চঞ্চল হতে দেখেছিলাম। হাঁ, চঞ্চল হতে দেখেছিলাম তাকে ঠিক একটি দিনের জন্যই। চিরদিনের নিরীহ, নিরুদ্বেগ, নিতান্ত সাধারণ একটি মানুষ কেমন করে না জানি একটি মুহূর্তের মধ্যেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল।

দুপুর বেলা রাজপথের এক প্রান্তে অমন করে বসে থাকতে এর আগে তাকে আর কোনদিন দেখিনি। দূর থেকে আমাকে দেখে মুখ লুকিয়ে উঠে চলে যাবার চেষ্টা করেছিল বটে। চোখাচোখি না হলে হয়ত সত্যই চলে যেত।

কাছে এসে দাঁড়ালাম। কথা কইল না। রুক্ষ মলিনচেহারার দিকে চেয়ে বললাম—নাওয়া খাওয়া হয়নি—বসে আছ যে? কাজে বেরোওনি বুঝি?

মনেই ছিল না, সহানুভূতি মাঝে মাঝে কি ভয়ানক পীড়াদায়ক হয়ে উঠে। তার সেই রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখখানা ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল।

বলল—না বেরোইনি, তুমি যাও যেদিকে যাচ্ছিলে।

তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলে সে উত্তেজিত

হয়ে বল্‌ল—বন্ধুত্ব ? বন্ধুত্ব কাকে বলে জানো ? আমার কথা মনে করেচ কোনোদিন ? আমি কি চাই একথা কোনদিন আমায় বলেচ ?

নিঃশব্দে তার দিকে চেয়েছিলাম। বেচারি যে কোন আঘাত পেয়েছে তা মনে হল না। নিতান্ত সঙ্গোপনে সকল কথার আড়ালে এ আগুন যেন তার মধ্যে জমে উঠেছিল। অবাক হয়ে দেখলাম তার সেই কঠিন শুষ্ক মূক দুটি বড় বড় চোখে এর মধ্যে কখন জল ভরে এসেচে। ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেলে সে বল্‌ল—তোমরা সবাই মিলে আমায় সরিয়ে দিচ্ছ, নিজের কথা শুধু নিজে ভাবতে আর আমি পারি নে! সকলের মাঝখানে আমি থাকতে চাই!

একটু থেমে আবার বল্‌ল—তোমার জন্যে আমি ভাববো, আমার জন্যে তুমি—নৈলে, নৈলে আমার দিন চলবে কেমন করে বলতে পারো ?

মনে হলো, পৃথিবীর সবার সঙ্গে একটি আত্মীয়তার বন্ধনের মধ্যে বাঁধা পড়ে নিজেকে মুক্তি দেবার জন্যে তার অন্তরাত্মা যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেচে!

উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে একান্ত মিনতির সুরে বলল—যদি এসেচ তবে যা হোক্ একবার উপায় বলে দিয়ে যাও ভাই।

একটুখানি হাসলাম। চন্দ্রা, আমার সেই নিজের হাসি আজো স্মরণ করতে পারি।

এমনি করেই দেখে গেচি জীবনের চেহারা পথে ঘাটে। সেদিন চলন্ত ট্রেনের ভিতরে শুয়ে কেমন করে আমার ঘুম ভাঙল, শোনো চন্দ্রা:

...আমার কী আছে? একলা কোন দিকে যাবো বলতে পারো? দিব্যি করে' বলো আগে আমায় ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না? তোমার আর কি, একটাব বদলে আর একটা, আমাব তো আর তা নয়। তখন কি উপায় হবে আমাব? বলি শুনতে পাচ্ছ? আমাব কথা শুনতে গেলেই বুঝি তোমাব ঘুম আসে?

আরে না না, বসে' যাওনা তুমি, ঠিক শুনচি। একটু তাড়াতাড়ি করে' বল। হুঁ, 'একটাব বদলে আর একটা'—তারপর?

—কখনো বাইরে বেরোইনি, কোন কাজ জানিনে, আপনাব বলতে কেউ নেই। কি করে' তখন আমি নিজেকে বাঁচাবো?

কান্নায় যে তোমাব গলা বুজে এল। হরি হরি, ছেড়ে-ছুড়ে পালাবো কিনা সেই ভাবনাতেই যে গেলে।

তোমাকে আমি জানি তাই একথা বলচি।

কি আশ্চর্য্যি, জানো অথচ সঙ্গে আসতেও ছাড়লে না? দেখো একটা কথা বলি শোন, ভালবাসার মধ্যে ঈর্ষা থাকতে পারে কিন্তু সন্দেহের স্থান তার মধ্যে নেই।

এইবার বুঝি তোমার বক্তৃতা আরম্ভ হল। আমার নিজের

সুতো

থাটা ভুলিয়ে দিতে পারলে তুমি আর কিছু চাও না—কেমন ?

'আরে তাই ত বলচি, প্রেম চিরকালই আত্মভোলা। স্বার্থ ছাড়া রা এক পা চলে না, তাদের আবার ভালবাসা কি ? ও নৌকোয় মি পা দিয়ে থেকো না, বুঝলে ?

কিন্তু তুমি যদি ছেড়ে যাও, তখন দাঁড়াবার জায়গা কোথায় পাবো ?

সে কি কথা ? তোমার এত রূপ থাকতে,—হা ভগবান, তোমার দেহের জেল্লারও কি একটা দাম নেই ?

আছে বৈকি,—ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে—তার জন্যে যে নিন্দে করে সে নির্লজ্জ। তুমি যে এত কুকীর্ত্তি করে' বেড়াও তাতে দোষ নেই ?

.. ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসলাম। রাত কত কে জানে, বোধ য় একটা হবে। শীতকালের মাঝামাঝি। ঠাণ্ডায় সবাই জড়সড় য়ে কুঁকড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে কি সে রয়েছে হঠাৎ এক নজরে কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই। ট্রেন লচে। লোহায় লোহায় প্রচণ্ড সংঘর্ষের বিচিত্র আওয়াজ ছাড়া আর কছুই শোনা যাচ্ছিল না। এই কিছুক্ষণ আগে গয়া পার হয়ে এসেচে।

যাত্রী সব শুদ্ধ জন দশেক। সবারই আপাদমস্তক অবগুণ্ঠন। স্ত্রী আর পুরুষে কোন প্রভেদ বোঝা যাচ্ছে না। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী একটী মাত্র আলো তাও আবার বিশেষ উজ্জ্বল নয়। মানুষের চেহারা স্পষ্ট করে' দেখতে গেলে ভ্রূ কুঞ্চন করতে হয়।

কি আশ্চর্য্যি, লোকে চাকরী করে' পেট চালায়, তুমি না হয় · একই কথা। তা ছাড়া,—কি মশাই, আপনি যে উঠে বসলেন? কি দেখচেন? দেখতে ইচ্ছে হয় ত সুমুখেই আসুন না!

এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে একেবারে অবাক্ হয়ে' গেলাম!

—গৌরীবালা, ওঁর দিকে একবার মুখ ফেরাও ত,—নিন্, দেখুন মশাই, ভাল করে' দেখে নিন্! বাঙালীর ছেলে মনে হচ্ছে, বিয়ে করেন নি তা ত দেখতেই পাচ্ছি!

আজ্ঞে হ্যাঁ!—বোকার মত বললাম। তৎক্ষণাৎ আবার যোগ করে দিলাম—কেন বলুন ত?

তাই বলচি, কাঁচা বাঁশ সহজেই নুইবে!—এবার গৌরীবালার সঙ্গে যা হোক একটা পাতিয়ে নিন্—দিদি, বৌদি, কি গঙ্গাজল—যা হোক একটা কিছু—নইলে যে সুবিধে হচ্ছে না।

বললাম—কিসের সুবিধে?

দেখুন, বোকা সাজবেন না, সমস্তই আপনি বুঝতে পাচ্ছেন আপনার মত দুটো পাজি চোখ আমি আর কোথাও দেখিনি।

লোকটির কলহের প্রবৃত্তি অতিমাত্রায় প্রবল। শুধু বললাম—আপনি কি অপরিচিত লোকের কাছে এই ভাবে কথা বলেন?

মোটেই না—লোকটি হেসে বল্ল—এ ভাষা শুধু আপনার জন্যই ব্যবহার করচি। ভাল করে' আপনাকে বোঝাতে হবে ত!

একটা চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল।—

কি মশাই, রাগ কল্লেন নাকি ?

রাগ ? কৈ না রাত অনেক হল—এবার একটু ঘুমোনো যাক্।

মোটেই ঘুমোননি এতক্ষণ ?

এই আধ ঘণ্টাখানেক কেবল কাৎ হয়ে—

বাস্ বাস্, ওতেই হবে—যথেষ্ট। আজকাল শোনা যাচ্ছে তেরো-মিনিট ঘুমোলেই আবার সহজ মানুষ। আসুন, ওই দিক দিয়ে ঘুরে সামনে এসে বসুন।

অনুরোধটা ঠিক হুকুমের মত শোনালো, তবুও এড়াতে পারলাম না। উঠে ওপাশ দিয়ে গিয়ে তাদের ঠিক সম্মুখের বেঞ্চিতেই বসলাম।

—কিছু মনে করবেন না, ছেলেমানুষ বলেই কড়া কথাগুলো তখন বললাম। রাস্তা ঘাটে এমন হয়েই থাকে, আবার মিটে যায়।

—হ'ল এক তরফা, আমার দিক দিয়ে বোধ হয় কোনো অন্যায় ছিল না।

মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, এবার একটু খুস্‌খুস্ করে উঠল। গুছিয়ে ভাল করে বসে মুখের কাপড়টা সরিয়ে বেশ সহজ গলায় বলল—আপনি কি বাইরের মেয়েদের দিকে তাকান্ না ?

একবার তার দিকে তাকিয়ে লোকটিকে বললাম—এ কথার কোনো মানেই হয় না।

লোকটি যদি-বা হাসল, মেয়েটি তীক্ষ্ণ গলায় বল্‌ল—নিশ্চয়ই মানে হয়। বরং আপনার এ সাধুগিরিরই কোনো মানে হয় না।

সাধুগিরি নয়, আমি বল্‌চি ভদ্রতার কথা, নীতির কথা।

লোকটির বোধ হয় তন্দ্রা আসছিল, আচম্‌কা চোখ চেয়ে বল্‌ল—নীতির কথা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

একটুখানি হেসে সরে লোকটি গেল, গায়ে মাথায় আবার মুড়ি দিল, তারপর বেশ করে' গুছিয়ে আরাম করে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজ্‌ল।

মেয়েটি হাসতে লাগল। বল্‌ল—ওই দেখুন, আপনার নীতি ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিল বোধ হয়!

ওঠবার চেষ্টা কচ্ছিলাম।· মেয়েটি বল্‌ল—কত দূর যাবেন?

এই বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত।

ও, আমরা আসচি কাশী থেকে, কলকাতা যাবো।

কাশী থেকে আসচেন?

লোকটা চোখ বুজেই এবার কথা বল্‌ল—হ্যাঁ, কাশীর মেয়েকে চিন্‌তে আপনার এত বেশী দেরি লাগে? আর কি, এবার দেখুন? রূপ দেখুন, কেমন কাপড় চোপড় পরা আছে দেখুন—তারপর দেখুন সধবা কি বিধবা—

আঃ, তুমি লোককে অপ্রস্তুত করবার একটি!

লোকটি কোন উত্তর দিল না, আগেকার মত চোখ বুজেই ঠোঁট উল্‌টে একবার হাসির ভঙ্গী করে' পড়ে রইল।

মেয়েটি আবার নিঃসঙ্কোচ সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—বিয়ে হয়েচে আপনার ?

ঘাড় নেড়ে বললাম—না, এখনও—

লোকটি মুদিত দৃষ্টিতেই বল্‌ল—করেন নি ? আশ্চর্য্য ত। আমার এই বয়সে অন্ততঃ বিশ পঁচিশবার……এই দেখুন না, ষোল বছর বয়স থেকে পথে ঘাটে যেখানে যত দেখেছি, মনে মনে সবাইকেই —বুঝলেন না ? নীতিতে আমার এতটুকু বাধেনি। •কোনো মেয়ের রূপের প্রশংসা করা মানেই মনে মনে তার সঙ্গে,……ওকি গৌরিবালা, এবার একেবারে ঘটা করে' মাথায় কাপড় টেনে দিলে যে ? আরে বসুন মশাই, ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। দু' একটা নীতির কথা বলে যান্, আমাদের দুরবস্থা দেখচেন তো ?

মুখ তুললাম।

এই দেখুন না মশাই, আমাদের জীবন একেবারে দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌ল !

কেন ?

• আর কেন। স্বাধীন প্রেম করার মত পাপ আর দুনিয়ায় নেই। ঢের ভাল মশাই, বাল্য-বিবাহ ঢের ভালো। আমাদের গোঁড়া হিন্দুর

মেয়ে জ্যোঠি-মা ঠিক কথাই বলেন। আমাদের মতন ছেলে-মেয়েকে নুন গিলিয়ে মারাই উচিত।

এরা কে, কোন্ জাতের লোক, দুজনের মধ্যে সম্বন্ধটা কী, কিছুই সহজে বোঝবার উপায় ছিল না।

বললাম—আপনার বাড়ী কোথায়?

লোকটা বল্‌ল—পরিচয় নিতে চান? দেবো না মশাই, আপনি যে বিনিয়ে বিনিয়ে মেয়েলি কথায় আমার কুলুজি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন, তা হবে না। পরিচয় চাইতে গেলে আপনাকে এখান থেকে উঠিয়ে দেবো।

মেয়েটি বল্‌ল—পরিচয় চেপে রাখো কেন সেটাও ওঁকে বলে দাও।

উনি কি আর এতক্ষণে তা বোঝেননি? আমায় দেখে কি খুব সাধু পুরুষ মনে হয়? তবে শুনুন মশাই, সেই দশ বছর বয়সে প্রথম আমি একটি মেয়েকে নিয়ে আসি—

থাক্—গৌরীবালা তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌ল—তুমি ঠাট্টা-তামাসা কর বুঝতে পারি কিন্তু তুমি গল্প ফেঁদো না। গল্প তোমার মুখে মানায় না!

লোকটা এবার অপ্রস্তুত হয়ে কৃত্রিম কোপে চীৎকার করে' উঠ্‌ল—তবে তোমার গল্পই ওঁকে শুনিয়ে দেবো নাকি? মশাই বুঝলেন—এই যে মেয়েটিকে দেখছেন, ইনি ভূ-স্বর্গে উর্ব্বশীর মত.... বল্‌ব—আরো

বল্‌ব—আরো বল্‌ব? তোমার আত্মকাহিনীগুলো ফাঁস করে' দেবো?

উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লাম—দোহাই আপনার, মুখের আগল আর খুলবেন না! এই আমি তবে এখান থেকে—

আহা হা, রাগ করেন কেন মশাই? বসুন, বসুন—তাই কি আর বলতে পারি? গৌরীবালা অনেক বিশ্বাস করে' আমাকে ওর গল্প বলেচে। আপনি বাইরের লোক, তাই কি আর বল্‌তে পারি?

গৌরীবালার কোন সঙ্কোচ নেই, কোনো দ্বিধা নেই, নারীর সব চেয়ে যে বড় দুর্ব্বলতা তার সম্বন্ধে কোনো চেতনা নেই।

বল্‌ল—কি বাকি রাখ্‌লে বল্‌তে? কোনো মেয়ের জীবনের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করার মত পাপ সংসারে আর কিছু নেই তা জানো? আর সে-পাপ শুধু তুমিই কর্‌তে পারো।

লোকটা সানন্দে বলে' উঠল—দেখে নিন্‌ মশাই, কি রকম লেখা-পড়া জানা মার্জ্জিত মেয়ে-ছেলেকে নিয়ে আমি পথ চলি। এ রকম পালিশ করা মেয়ে দেখেচেন এর আগে?

বললাম—আপনাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা এখনো কিন্তু বুঝতে পারলাম না।

লোকটা বল্‌ল—খবরদার, ও আপনার নীতিতে বাধ্‌বে! তা ছাড়া আমি মেয়েদের একটু সম্মান রেখে চলি মশাই। আমার চরিত্র-কথা আপনাকে বল্‌তে পারি—কিন্তু রাম বল, গৌরীবালার কাহিনীগুলি

আপনার কাছে প্রকাশ কর্‌তে পারবো না। তবে বোঝাপড়াটা কী জানেন? আমাদের মধ্যে কোনো আটক নেই, কোনো বাঁধন নেই, লুকোনো কিছু নেই। দু'জনেই দুজনকে জানি কি না।—ওকি, অমন হাঁ করে' বোকার মত চেয়ে রইলেন কেন মশাই? বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? বন্ধু—বন্ধু মশাই আমরা। কে যে মেয়ে আর কে যে পুরুষ এ আমাদের অনেক কষ্ট করে' ভুল্‌তে হয়েচে!

গৌরীবালা বল্‌ল—এবারেও আপনার নীতিতে বাধ্‌লো নাকি?

বল্‌লাম—স্ত্রী পুরুষের শুধু বন্ধুত্ব কে বিশ্বাস কর্‌বে বলুন।

নাই বা কর্‌ল। আপনি ওটার দিকে অত ঝোঁক দিচ্ছেন কেন? —গৌরীবালা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল।

মুখের একটা শব্দ করে' লোকটা এবার বল্‌ল—বালক, দেখ্‌চ না? আপনার সঙ্গে কথা বলাটা আমাদেব গর্ব্বের পক্ষে হানিকর! সকল কথা এড়িয়ে ভাগাড়ের দিকেই আপনার নজর এত বেশী কেন? আপনি দেখ্‌চি নিতান্তই……

বড একটা ষ্টেশনে এসে গাডী দাঁড়াল। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেচে। দুরন্ত শীতের কুয়াসা, জান্‌লা দর্‌জা চারিদিকে বন্ধ—এ সমস্ত পার হয়ে ফেরিওয়ালার চীৎকার আর কারো কানেই পৌঁছচ্ছিল না।

গৌরীবালার কথার আব্‌রু ছিল না, সঙ্কোচের বালাই ছিল না কিন্তু কথার মাধুর্য্য ছিল। তার নীতিজ্ঞানহীনতা বিকৃত নয়, সরল বিশ্বাসের

উপর তার প্রতিষ্ঠা। তার কুরুচি তাকে সৌন্দর্যশালিনী করে' তুলেচে। এত যে আঘাত, এত যে তিরস্কার পেলাম সমস্তই কেমন করে' না জানি সহ্য হয়ে গেল।

লোকটির চোখে আবার ঘুম জড়িয়ে এসেছিল।

একটু সহানুভূতির কণ্ঠে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম—শীতে আপনার কষ্ট হচ্ছে, আমার কম্বলটা নেবেন?

লোকটা আবার সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌ল—না থাক, ঘনিষ্ঠতা পাকিয়ে তোলবার আর দরকার নেই, উনি বেশ ভালই আছেন।

অকস্মাৎ এই অপমানে মুখখানা আমার কালি হয়ে গেল।

…এইগুলো আপনাদের বুঝ্‌তে পারিনে, এই ন্যাকামিগুলো। মেয়েদের কষ্টের জন্য আপনাদের মাথা ব্যথা এত বেশি বেড়ে গেচে যে পৃথিবীতে আর টেকবার উপায় নেই। একটি মাত্র মেয়ের দেহকে খুসী করবার জন্য পৃথিবীর চারিদিকে আজ এত অশান্তি। জগতে দিকে দিকে এই যে এত কাণ্ড ঘট্‌চে এর গোড়ায় নারী দেহের প্রতি একটি প্রচণ্ড লোভ ছাড়া আর কি আছে বলুন দেখি?—আরে মশাই, বসুন বসুন, চটে যাচ্ছেন কেন?

বল্‌লাম—মাথা ধরে' গেচে।

মাথা ধরে' গেচে? গৌরীবালা, মাথায় ওঁর একটু হাত বুলিয়ে দাও ত!

তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌লাম—আপনার মুখে কি কিছুই বাধে না?

বোঝেন না মশাই, বোঝেন না। মেয়েরা হচ্ছে শক্তি। একটু ছোঁয়া লাগ্‌লেই দেখবেন গায়ে দশ হস্তীর বল!—তৎক্ষণাৎ কথা ঘুরিয়ে সে বল্‌তে লাগ্‌ল—জগতে যারা বড় বড় কাজ করে' গেচে তাদের জীবন তন্ন তন্ন করে' খুঁজুন গে, দেখবেন তাদেরও আপনার মতো মাথা ধর্‌ত আর মেয়েরা দিত হাত বুলিয়ে। ওরা হচ্ছে সোনার কাঠি, ছুঁলে আর দেখ্‌তে নেই!

তবে এই যে একটু আগে বলছিলেন যে—

গৌরীবালা এবার সত্যিই হেসে উঠ্‌ল। বল্‌ল—আপনি বুঝি ওঁর কথার সামঞ্জস্য খুঁজ্‌ছিলেন এতক্ষণ? এখনো বুঝি ওঁকে বুঝ্‌তে পারেন নি?

রাগ হয়ে গিয়েছিল। বল্‌লাম—বুঝে আর কাজ নেই। মাত-লামিরও একটা সীমা আছে।

উঠ্‌তেই যাচ্ছিলাম, লোকটা আবার হাত ধরে' বসিয়ে দিল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে একটুখানি হাসতেই গৌরীবালা বল্‌ল—রাগ করবেন না, আপনি কিন্তু সত্যিই ছেলেমানুষ। আপনি এখনো কথার মানে খোঁজেন, ধ্যান-ধারণার দাম যাচাই করেন, মতে না মিললে তর্ক কর্‌তে যান, এ সবগুলো ত আর—

লোকটা এবার বল্‌ল—তাই বটে। দুনিয়ার ছন্দের দিকে নজরটা

আপনার ভারি কড়া দেখছি। এ-ঘোর কাটিয়ে উঠুন, বুঝলেন, নৈলে ভারি কষ্ট পাবেন। কিছুরই কিছু মূল্য নেই, মুখের কথাগুলো ফাঁকা কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বল্‌লাম—আর ওই যে তখন আপনি বিয়ে আর সতীত্ব নিয়ে যা বল্‌ছিলেন, ওগুলো ?

লোকটা বল্‌ল—ছেলেমানুষ হলেও আপনি একেবারে কচি নন্। বিয়ে আর সতীত্ব এদুটোর মানে কি আপনি আজও বুঝেছেন ?

তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। পরে বললাম—আচ্ছা না-হয় ও-দুটো বুঝিনে, কিন্তু এই নরনারীর স্বাধীনতাটা ?

মেয়েটি হাসতে হাসতে উত্তর দিল—সে আবার কি ? খাই-দাই, হাসি-খেলি, স্বামী নিয়ে কিম্বা স্ত্রী নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করি স্বাধীনতা আবার কি ? আপনি এত বাজে বকেন কেন ?

বোকার মত গৌরীবালার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে' তাকিয়ে রইলাম।

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা বল্‌ল—পাগল নাকি আপনি ? মাথা খারাপ ?

এবার আর সহ্য হল না। উত্তেজিত হয়ে বললাম—দু'জনে মিলে আপনারা আমাকে অপ্রস্তুত করবার চেষ্টা করুছেন।

লোকটা বল্‌ল—গৌরীবালা, এবার এ-ছেলেটা সত্যিই চটে গেচে দেখ্‌চি।

চটে গেচি? মিথ্যে কথা! আপনাদের কথায় চটে যাওয়া বোকামি!

গৌরীবালা বল্‌ল—রাগ করো না ভাই, তুমি যে একটু বোকা তা আগেই বুঝ্‌তে পেরেচি।

কণ্ঠের মাধুর্য্য দিয়ে মেয়েটি তার তিরস্কারকে সুন্দর করে' তুল্‌ল। কোন কথাই আর মুখে এল না।

শুধু বললাম—আমিই না হয় বোকা, কিন্তু আপনাদের কথাবার্ত্তারও একটা কিছু লক্ষ্য থাকা উচিত ত?

মাটি করেচে!—লোকটা বলে' উঠল—এর উপর আবার লক্ষ্য? দোহাই, আর আপনি জ্বালাবেন না, মাথায় আপনার গোবর ভরা! ভালয় ভালয় এবার আপনি নেমে যান্‌। কোথায় নামবেন বলুন ত?

ধৈর্য্য রাখা এবার সত্যিই কঠিন হ'ল। বললাম—তা হলে' বোধ হয় প্রেমও মানেন না?

লোকটা চীৎকার করে' উঠ্‌ল—এই রে। যা ভয় কচ্ছিলাম এতক্ষণ, ঠিক তাই। এ বেচারাকে দেখ্‌চি বর্দ্ধমানে নামিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে হবে!—ওকি গৌরীবালা, তুমি আবার পুঁটুলি থেকে কি বা'র কচ্ছ?

গৌরীবালা তাড়াতাড়ি দুটি মেঠাই সুমুখে এনে ধরে' বল্‌ল—কাশীর মিষ্টি, খান্—না, না, খেতেই হবে, ধরুন! তা নৈলে জোর করে' আমি মুখে গুজে দেবো বলে' দিচ্ছি!

উত্তেজনায় নিজের হাত-পা কাঁপছিল, তবুও মেঠাই নিয়ে মুখে দিতে হল। তারপর ফুলতে ফুলতে আবার নিজের জায়গায় এসে বস্‌লাম। গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েচে। বোবা হয়েই রইলাম।

পথ আর বাকি ছিল না, সকাল হবার আগেই বর্দ্ধমান এল। পাশের জান্‌লাটা খুলে' দিলাম,—ভোরের হাওয়া চলাচল করচে।

প্লাটফর্‌মে গাড়ী এসে থাম্‌তেই উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা হাসিমুখে এবার ঘাড় ফিরিয়ে বল্‌ল—কি মশাই, বলি ও সুনীতিবাবু, নেমে চল্লেন, একটা নমস্কারও করে' গেলেন না? না-হয় স্ত্রীলোকের সম্মানটাই রেখে যান? সতী-সাবিত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ত আপনার খাঁটি এবং অকৃত্রিম!

মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—উনি কি আপনার স্ত্রী?

স্ত্রী নয়, আপাতত ধর্ম্মপত্নী।

গৌরীবালা বলে' উঠ্‌ল—কথায়-বার্ত্তায় বুঝতে পারেন নি এতক্ষণ?

লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

—ছাড়ুন মশাই, ছেড়ে দিন্—আপনাদের ন্যাকামি আর ভাল লাগ্‌চে না!

—গৌরীবালা, সত্যি তোমার দিব্যি—আর দু ফোঁটা ওষুধ দিয়ে দাও। বেচারা শুক্‌নো মুখেই ফিরে যাবে?

গৌরীবালা উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—আঃ তুমি ভারি দুষ্টু লোক, ওঁকে নিয়ে কেন অমন টানা-হেঁচ্‌ড়া কচ্ছ?—কাছে সরে এসে আমার দুটো হাত ধরে সে পুনরায় বল্‌ল—রাগ করলে ভাই আমার ওপর?

রাগ?—তার মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেলাম। গত রাত্রি থেকে এখন পর্য্যন্ত সবার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সমস্তই ভুলে গেলাম। ভুলতে আমার এক মুহূর্ত্তও লাগল না। গৌরীবালার দৃষ্টি ভোরের আকাশের মত স্নিগ্ধ এবং সকরুণ।

…না, আপনার ওপর রাগ হয় না।—বলে' কম্বলটা নিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে নেমে চলে' গেলাম।

কিছুদূর গিয়ে হাসির আওয়াজে ফিরে তাকালাম। বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। জানলায় মুখ বাড়িয়ে নরনারী দুটির হাসি আর থামে না। হাস্‌তে হাস্‌তে বুঝি-বা তাদের দমই বন্ধ হয়ে আসে।

চোখ বুজেই তোমার সঙ্গে আলাপ করে যাই চন্দ্রা, কিন্তু এ ছাড়াও ত আছে বিস্তৃততর জীবনের কথা। অভাব-অভিযোগে, দৈন্য-দারিদ্র্যে মানুষের কণ্ঠ যেখানে অবরুদ্ধ হয়ে এসেচে! আমি ত পথে পথে দেখে গেচি তার কোনো প্রতিকার নেই, প্রতিবিধান নেই!

একটি রাত্রির কথা বলি, শোনো চন্দ্রা: ৮

রঙীন সুতো

চাদর মুড়ি দিয়ে শীতের ঠাণ্ডা আট্‌কায় না, পা গুটিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ষ্টেশনের বেঞ্চিতে শুয়েছিলাম।

নিতান্তই গ্রাম্য ষ্টেশন। অত রাতে লোকজন কেউ নেই, গাড়ী আসবার তখনো দেরি রয়েচে; চারিদিক খাঁ খাঁ করচে, ঘুমোবার একটা চেষ্টা ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত শীতের হাওয়ায় ঘুম আসছিল না। এম্‌নি সময় কখন দুটো লোক এসে পায়ের দিকে খালি বেঞ্চিটুকু অধিকার করে বসেচে টের পাইনি, তাদের গায়ে পা লাগতেই বুঝলাম তন্দ্রা এসেছিল। পা সরিয়ে নিয়ে আবার আগেকার মত পড়ে রইলাম।

লোক দুটি মাঝে মাঝে কথা বলছিল, শোনবার মত কৌতূহল আমার ছিল না। শুধু গলার আওয়াজ শুনে অনুভব করলাম, একটি লোক বসেচে বেঞ্চির উপর আর একজন তারই সুমুখে যাতায়াতের পথের উপর উবু হয়ে বসে কথাবার্ত্তা কইচে।

—গাঁয়ের ইতিহাস তুমিও ত কিছু কিছু জানো সামন্ত, তুমিও ত কম দুঃখ পাওনি।—ওকি, হুঁকো নেই শুধু কল্‌কে? আচ্ছা তা হোক কল্‌কেই সাজো একছিলিম খেয়ে বাঁচি, যে ঠাণ্ডা! তামাক কি আর গাঁয়ে কেউ খায় সামন্ত, এক পয়সায় দু'খানি পাতা, ক'জন কিনতে পারে বল।—বলে বেঞ্চির উপরের লোকটা খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে অস্থির হয়ে বললে, এ আর তুমি কতটুকু দেখচ সামন্ত, এ-কাশি যা হয়েছিল তার তুলনায়—জ্বরও এখন আর নিরানব্বইয়ের ওপর ওঠে না।

সামন্ত বললে, এবার একটু বিশ্রাম নিন্ ডাক্তারবাবু, খেটে খেটে শরীর ত আপনার...এবার দিনকতক—

—ভাঙতে বসেচে কিন্তু ভাঙেনি সামন্ত, ভাঙলেই বাঁচি। বড় ছেলেটা গিয়ে পর্য্যন্ত বুকটা একেবারে খালি হয়ে গেচে। হয়ত কল্‌কেতা থেকে ভাল ডাক্তার সময় মত আন্‌লে ছোঁড়াটা ··তার কপালের লেখা, হয়ত কিছুতেই বাঁচত না, লাভে হতে রোগের খরচে পৈতৃক চালাটুকু আমার—

কল্‌কেয় ফুঁ দিতে দিতে সামন্ত বললে, এর নামই সংসার,—আসুন, তামাক ধরেচে।

তামাক টান্‌তে টান্‌তে ডাক্তারবাবু বিরক্তিকর কাশি কাশতে লাগলেন। এক সময় বললেন, তিনু ভট্‌চাযিার গরুটা কি ছাড়িয়ে নিয়ে গেচে সামন্ত?

আজ্ঞে না, ছ আনা পয়সা নৈলে ··গরু আটকাবার সময়ই আমি জানি ভট্‌চাযিা তিন দিনে পয়সা যোগাড় করতে পারবে না। ছ আনা পয়সা এখনকার দিনে, আমিই বা কি করব বলুন, থানার নেই রোজ-গার, দারোগাবাবুর ধমক সয়ে সয়ে চাকরি বজায় রাখা...তিনু ভট্‌চাযিার শান্ত গরু, কারুর খামারে ঢোকে না।

—তবে কেন আটকালে?

—সে আর বলবেন না ডাক্তারবাবু। মাগ-ছেলে নিয়ে যাকে সংসার

করতে হয়•• অভাবের ঘর•••ছক্কাই পাঞ্জাই না করলে তার—

—তা সত্যি সামন্ত। ধর, তামাক খাও।—হ্যাঁ, তা বটে। আর তোমার ত রোজগার ওই সাতটি টাকা, যুদ্ধর বাজারে এক জোড়া কাপড়ের দাম, তোমার ওতে কীই বা হয় বল।

—কিছুই না, কলাটা-মুলোটা•••আগে পালা-পার্ব্বণে এক আধটা জামাকাপড় গাঁয়ের লোক দিতই, সে ত আপনি জানেন ডাক্তারবাবু, তারপর সেই মেয়ে-চুরির মামলায় সাক্ষী দিতে গিয়ে • সেই আমার কাল হল।—বলে সামন্ত একটি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে পুনরায় বললে, না: সেদিন আব নেই। কোথায় বা সেই চৌধুরী-গিন্নি, লক্ষ্মীরূপা মা আমার, আব কোথায় বা আমাদের আচায্যিদের ঘর।

—হ্যাঁ সে একদিন ছিল সামন্ত, কত খেয়েচি, কত—

—শুধু খেয়েচি? লুট করেচি, ভুট্ করেচি,—গাঁয়ের শুকনিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে তাদেব আব কি রাখ্‌ল? শেষে তারা পালিয়ে বাঁচ্‌ল।

—উপায় কি সামন্ত, এ যে শ্মশান। তুমিই বল না আজ আমার অবস্থা কি এমন হতো? ওষুধের ব্যাগ হাতে নিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরি, লোকে ডাকবেই বা কেন? হ্যাঁ যদি পাশ করা ডাক্তার হতাম তাহলে না হয় কথা ছিল। সেদিন পাঁচটি পয়সার তাগাদায় গিছলাম, বামুনেব ছেলেকে কৈবর্ত্তরা কী অপমানটা কল্লে দেখলে ত? দোষ দেবো কাকে? আমার ওষুধে রোগ সারেনা কেন সে ত আমি জানি। দুঃখু

নেই সামন্ত, রাগও নেই। গেল পুজোর সময় ছোট ছেলে পাঁচটা টাকা পাঠিয়েছিল, আট আনা তার থেকে তুলে রেখেছিলাম বিচেলি কিনব বলে, ঘরের চালে ফুটো, সে পয়সাও গেল খরচ হয়ে। রাজুর কাছে একখানা পোষ্টকার্ড চেয়েচি ছেলেকে আবাব লিখ্ব। আজ তিন দিন হাঁটাহাঁটি করচি বাজুর কাছে, তিন পয়সা আজকাল পোষ্ট-কার্ডের দাম, না সামন্ত ?

সামন্ত বললে, হ্যাঁ সেদিন বটে দারোগা বাবু বলছিলেন !

—লিখ্ব একখানা চিঠি, বুঝলে ? রাজু যদি না দেয়, আমিই খরচ করব তিনটে পয়সা। দিন আর আমাব চলে না সামন্ত।

—তা কেমন করে চলবে বলুন, অতগুলি পুষ্যি যার—

ডাক্তারবাবু বললেন, আমিই একমাত্র ডাক্তার, যার নাম আছে অথচ ডাক নেই। প্রশংসা শুনি আর উপবাস করি।

সামন্ত বললে, কিন্তু আগে ত আপনার যথেষ্টই—

সে আগে, কিন্তু এখন ? আমার অবস্থা এক সময় স্বচ্ছল ছিল সেটা গল্প-কথা। স্রোত এসেছিল, ভেসেছিলাম ; স্রোত চলে গেল, চড়ায় আমার নৌকো হল বানচাল।

ওরা বলে আজকাল আপনার ওষুধে আর—

রোগ সারে না, এই ত ? সে দোষ কার সামন্ত ? তোমরা দু'পয়সার বেশি একশিশি ওষুধের দাম দেবে না, আমি রোগ সারাবো

কী দিয়ে বলতে পার ? ওষুধের শিশিতে ওষুধ নেই, শুধু জল, তাতে কি রোগ সাবে ?

সামন্ত বললে, জল দেন ওষুধের বদলে ?

চুপ, কেউ যেন শুনতে না পায় সামন্ত, দিলেই বা শুধু জল, ও যে ওষুধের শিশি। দেবার সময় জলে মন্তর দিয়ে দিই।

সামন্ত জোরে জোরে কল্‌কেটা টানতে লাগল।

গলা নামিয়ে ধীরে ধীরে ডাক্তার বললে, আজ আমার কোথাও ঠাঁই নেই সামন্ত, যে ছিল সকলের মাঝখানে, তুমি সবই জানো, সে পড়ল সবার আড়ালে, আজ তার দাম কানাকড়িও নয়। সংসারে এমনিই হয়, এই নিয়ম। তার জন্যে দোষ দেবো কা'কে বল ত ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার পুনরায় বললে, তা বলে তুমি যা ভাবচ আমার হিংসে হয়েচে দেবেন সা'র ওপর ? মোটেই না। পঞ্চান্ন বছর বয়স হল হিংসে করিনি কারো ওপর। ও আমি জানিই নে। আমি ত জানি দেবেন সা বড় ডাক্তার, কলকাতার পাশ করা, পয়সা নিয়ে ওষুধই দেয়, জল দেয় না, রুগী ভাল হয় তার ওষুধ খেয়ে, তারা আমারই গাঁয়ের লোক, আমারই ছেলেমেয়ে .... হিংসে আমি করিনে সামন্ত, নিজের দারিদ্রের রাগ অন্যের ওপর তুলিনে।

সামন্ত বোধ করি ডাক্তারের সাধু ভাষা বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল।

হু হু করে কন্‌কনে বাতাস বইছিল। এই দু'টি মানুষের কথাবার্তা ছাড়া আর কোথাও জনসমাগম নেই। রাত্রি সাঁ সাঁ করচে। চাদরের ভিতরে নিঃশব্দে শুয়ে পা দুটি আরো কুঁকড়ে শরীরকে গরম করবার চেষ্টা করছিলাম।

এখানে কোথায় এসেছিলেন ডাক্তারবাবু?

এই এসেছিলাম সামন্ত, এখানেই। ভূপতির আসবার কথা, আমার ভাগ্যে গো, আগের গাড়ীতে আসেনি, যদি এ গাড়ীতে আসে। ভূপতি এসে যদি কিছু দেয়, বুঝলে না?

—হ, সামন্ত বললে, আমি এসেছিলাম মাষ্টার মহাশয়ের কাছে। গাড়ী চলে না গেলে তাঁর সঙ্গে আলো আছে আমার হাতে, মাঠের পথ… এক সঙ্গেই যাবো ডাক্তারবাবু।—গলা নীচু করে পুনরায় সে চুপি চুপি বললে, পাস্তির মাঠের ধার দিয়ে একলা নাই বা গেলেন, চোর-ডাকাতের কথা বলচিনে ওই জোড়া তালগাছের ধারে,—আছে ডাক্তারবাবু, আছে।

তোমায় ত আবার রাতে ভিতে বেরুতে হয় সামন্ত।

কি করব বলুন, চৌকীদারি করচি এই তেইশ বছর, মুখ খুলে বলিনি কোনোদিন। শরীর ত দেখছেন, হাড় ক'খানি সার… হাঁপানিটাও বেড়েচে ক'দিন। গাঁ পাহারা দিয়ে জীবনটা কাটল ডাক্তারবাবু। রাতের বেলা চোখ বুজে হাঁক্ পেড়ে চলে যাই, নিজের

পায়ের শব্দ শুনলে ভয় করে, পায়ের কাছে ব্যাঙ ছট্‌কালে আঁক্‌ করে উঠি···একেই ভয়তরাসে মানুষ আমি।—একটু থেমে সামন্ত আবার বললে, আমার চাকরি ত জানেন ডাক্তারবাবু—বুকে বল আসে, কি একটু সাহস বাড়ে এমন ওষুধ আপনি একটু দিতে পারেন ?

আছে বৈ কি সামন্ত, সঙ্গেই আছে, কত লোক এই ওষুধ খেয়ে—

সঙ্গেই আছে ? দিন্‌ তবে একটুখানি—

ডাক্তার ব্যাগ্‌ খুললে। খুঁজে পেতে ওষুধ বার করে বললে, এতে জল মেশানো নেই সামন্ত, এ একেবারে টাট্‌কা, তাজা,—বুঝলে ?—আন্‌কোরা।

ও, বেশ বেশ—দিন গালে ঢেলে, হাঁ করচি।

ঔষধ খেতে খেতে ষ্টেশনে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, গাড়ী আসচে। গাড়ী এসে দাঁড়াবার আগেই সামন্ত বললে, পায়ের ধুলো দিন যেন উপগার হয়···কাল আপনাকে দামটা পৌঁছে দিয়ে আসব ডাক্তারবাবু।

কাল ? আজ নয় ?—ডাক্তার ব্যাকুল হয়ে বললে, তোমার সরকারি চাকরি, তুমিও ধারে খাবে সামন্ত ?

ততক্ষণে গাড়ী এসে পৌঁচেচে। সলজ্জকণ্ঠে সামন্ত কি উত্তর দিল তা শোনবার আগেই পা ঝাড়া দিয়ে উঠে আমি গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলাম, চন্দ্রা। গাড়ী একমিনিট কি দু'মিনিট দাঁড়াবে।

কৃষ্ণকায়া নির্দ্দয় নিশীত-রাত। জানলা ও দরজা বন্ধ করে যাত্রীরা

ভিতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। দেখতে দেখতে গাড়ী ছেড়ে দিল জানলার বাইরে একজনের উদ্বেগ-আকুল কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—এল না, ভূপতি এ গাড়ীতেও এলনা, বুঝলে সামন্ত...ভূপতি অ ভূপতি, এলি বাবা?

কোথায় ভূপতি? ডাক্তারের ব্যাকুল চীৎকার পিছনে অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। নির্জ্জন অন্ধকার বিদীর্ণ করে বন্য জন্তুর মত তখন আমাদের গাড়ী ছুটেচে, চন্দ্রা।

তোমার সঙ্গে আলাপ হবার ঠিক আগেই যার কাছে বিদায় নিয়ে এসেচি তার কথা না বললে নারীর চরিত্র সম্বন্ধে কোথায় যেন একটা ভুল থেকে যায়, চন্দ্রা। তার সঙ্গে আমার শেষের দিনের গল্পটা বলে আপাতত শেষ করি। মন দিয়ে তুমি শুনবে ত?

বারান্দা পার হয়ে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালাম। মেঝের উপর একখানা বড় আয়নার সুমুখে বসে হিরণ্ময়ী তখন চুল বাঁধছিল। আয়নার ভিতর দিয়েই সে বোধ করি আমাকে লক্ষ্য করে থাকবে, চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে, "দেখা নেই যে এ-ক'দিন, গিয়েছিলে নাকি কোথাও?"

না, যাবো আর কোথায়।—তার অয়েল-ক্লথ পাতা বিছানাটার উপর উঠে বসলাম।

সে বললে, 'আজ যে হঠাৎ দেবতার আবির্ভাব?'

'এমনি এলাম ঘুরতে ঘুরতে…অনেকদিন দেখিনি।'

হিরণ্ময়ী হাসল। এমনি করেই সে হাসে,—শানিত বিদ্রূপের একটি বাঁকা হাসি। যেদিন এক দূর তীর্থপথে তার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল সেদিন তার এমনি হাসির চেহারাই দেখেছিলাম।

বললাম, 'কিছু ভাল লাগচে না হিরণ্ময়ি, যদি কিছু টাকা দাও ত চলে যাই কোথাও।'

হিরণ্ময়ী মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল। তার মুখে চোখে কোথায় যেন একটি স্নেহের ইঙ্গিত ফুটে থাকত, একটি দুর্লভ সারল্য। আবার সে মুখ ফিরিয়ে চুল বাঁধতে লাগল।

সেদিনটা ছিল প্রথম বসন্তকালের সন্ধ্যা। সূর্য্য ডুবে অন্ধকার হবার আগেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চারিদিক শাদা হয়ে উঠেচে। দক্ষিণ দিকের জানলার নীচেই একটা ভাঙা চোরা মাঠ, সেখানে খানকয়েক গরুর গাড়ী ল্যাজ তুলে মাটিতে মাথা নুইয়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদেরই একান্তে চাঁদের আলোয় বসে জনকয়েক গাড়োয়ান মাদল বাজিয়ে এরই মধ্যে গান জুড়ে দিয়েচে। মাঠের কোলে রাজ-পথের উপর দিয়ে লোকজন গাড়ী ঘোড়া উচ্চরবে আনাগোনা করছিল।

সেইদিকে চুপ করে চেয়েছিলাম, হিরণ্ময়ী এক সময় বললে, 'আচ্ছা, সেই এক রকম কালো হাড় আছে, বোধ হয় বন-মানুষের, জানো

কোথায় সে হাড় পাওয়া যায়? তোমার ত কত সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ, নিজেও ত তুমি একজন ব্রহ্মচারী,—বলতে পারো?'

'কী হবে বল ত? কা'কে বশ করবে?'

'দরকার আছে গো, বড় দরকার। আচ্ছা কোথায় কিনতে পাওয়া যায় জা না?—সত্যি বড় দরকার।'

সে আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না, চুল বাঁধা শেষ করে একটা পান গালে দিয়ে গড়গড়াটা বার করে তামাক সাজতে বসল। জল বদলে তামাকের উপর টিকে সাজিয়ে অগ্নি সংযোগ করে ফু দিয়ে বললে, 'তুমি আসো না, গড়গড়ারও আদর নেই, এরা ত সিগারেট ছাড়া আর কিছু খায় না!'

বললাম, 'উনি কোথায়? তোমার এই অবিনাশবাবু?'

হিরণ্ময়ী হেসে বললে, 'তাঁকে যাওয়া হয়েছে টাকা আনতে, এ-বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না…মৌমাছির মত—হাঁা, আমিই একরকম ঠেলেঠুলে পাঠালাম। বাড়ীতে স্ত্রী, সন্তান, সংসার—' বাকিটুকু সে হেসেই শেষ করে দিল।

'সে হয়ত তুমি বিশ্বাস করবেনা বললে—' বিছানায় বসে আমার একখানা হাত নিয়ে হিরণ্ময়ী বলতে লাগল, 'এগারো বছর বয়স তখন আমার বিয়ে হল, স্বামী ছিল খেলার সাথী। বাস্তবিক, হেসো না তুমি, তাকে আমি আশ্চর্য্য রকম ভাল বাসতাম। হাঁা, আজো তাব

মতন কাউকে আমি এত ভালবাসিনি। মেয়েমানুষ ভালবাসে এক-জনকেই, আর বাদবাকি—শোনো বলি, তারপর তেরো বছর বয়সে একদিন শেষ রাতে শ্বশুরবাড়ীর দরজা থেকে উঠলাম এক ঘোড়ার গাড়ীতে, সঙ্গে ঝি, আমাকে সে বায়স্কোপ দেখাবে,—কী আনন্দ। কিন্তু গাড়ী এসে এক জায়গায় থামতেই কে যেন আমার নাকের ওপর একখানা কাপড় চেপে ধরল, তার সামান্য গন্ধেই আমি জ্ঞান হারালুম।'

তারপর ?

'তারপর দশ বছরের ইতিহাস আর শুনতে চেও না। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনেক গ্লানি—' হিরণ্ময়ী একবার থেমে পরে বললে, 'ভালো কীর্ত্তন গাইতে পারি বলে আমার খ্যাতি হয়েছিল খুব, চেহারাটাও ত চলনসই, তাই আমার সামান্য শক্তিটুকু ফুলে-ফেঁপে অসামান্য হয়ে ভদ্র-সমাজের চোখে পড়লো, সমাজ মন্দ বললো না।

'কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়, একজায়গায় মুজরো করতে গেলাম। বড় বাগানবাড়ী বড় আসর। বাড়ীর কর্ত্তা মারা গেছেন তাঁর শ্রাদ্ধ, গান শুনতে বহু লোকের ভিড় হয়েছে। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই ছোঁ দিয়ে মেয়ে-মহলে নিয়ে গেল। কী আগ্রহ তাদের আমাকে কাছে বসিয়ে দেখবার। তাদের চোখে আমি দেবী কি দানবী ঠিক বুঝলুম না, শুধু দেখলুম তাদের কৌতূহল। কেউ গান

:টপে, কেউ করে আদর, কেউ করে' বসে উদ্ভট অভদ্র রসিকতা, .কউ বা খাবার এনে খাওয়ায়। আমার জীবনের প্রতি তাদের অদ্ভুত, আকর্ষণ।'

'তারপর ?'

'তারপর, কর্তার বড় ছেলে, যিনি আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা। বাড়ীর তিনিই গিন্নি, তাঁর শাশুড়ী নেই। প্রথমে দেখেই তিনি আমার দিকে কটাক্ষ করে বললেন, এই যে, বেশ পছন্দ করেই আনা হয়েচে দেখচি। তাঁর বিষাক্ত বাণ খেয়ে একটু দমে গেলাম। বললাম, আসুন, আমি যোগ্য নই আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াবার। —তিনি গ্রাহ্যই করলেন না, বরং আমার বিনয়-নম্রতাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, কদ্দিন আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েচে ?—কথাটার কুৎসিত ভঙ্গীতে সকলের সুমুখে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলুম, বিরক্ত হলুম। কিন্তু কী করব, তাঁদের ত আর অসম্মান করতে পারিনে, তাঁরা ভদ্রঘরের মেয়ে। শান্ত ভাবেই বললুম, তাঁর সঙ্গে ত তেমন আলাপ আমার নেই, ওই যা বায়নার সময় দেখা। তিনি বললেন, মিথ্যেবাদী, আমি চিনিনে আমার স্বামীকে ?—আহা বেচারা।'

—চিরপ্রভা হাসতে লাগল।

'বুঝলে, স্ত্রী চেনে স্বামীকে।' বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে হিরণ্ময়ী পুনরায় বললে, 'যেমন সকল স্ত্রীই চেনে সকল স্বামীকে।'

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম।

'হ্যাঁ, বলেই ফেলি তোমাকে, তুমিই বুঝবে।' হিরণ্ময়ী সোজা হয়ে উঠে বসল,—'বাইরে আসছি, বউটা ছুটে এসে আমার মুখে-চোখে কি যেন মাখিয়ে দিলে···যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে করতে···চারিদিক আমার অন্ধকার হয়ে গেল।

একটা চোখ ফুলে উঠল, তা থাক, কানা ত হইনি, তবুও সেদিন অত গোলমালের মধ্যে আমি গান গেয়ে এলাম, একজনের সামান্য ঈর্ষায় কেনই বা অত বড় আসর ম্লান হবে, তুমিই বল না? আসবার সময় টাকা নিইনি, শুধু সেই আসরে দাঁড়িয়ে হেসে বউটার স্বামীর হাত ধরে বলে এলাম, দয়া করে আমার বাসায় টাকাটা পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবেন? আপনিই যাবেন।'

হিরণ্ময়ী এবার উজ্জ্বল করে হেসে উঠতেই তার কানের দুল দুটো চিক্ চিক্ করে উঠল,—'হাই তুমি বল, আমার সে-হাসি আর অনুরোধ ব্যর্থ হয়নি, বাবুটি এলেন একদিন। উঃ কী কুৎসিত, লম্বা বোকা মুখ, ছোট ছোট কান, হাসলে জীবের ডগা আর মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। তার প্রতি আমার লোভ? হা, ভগবান! তবু সে হলো আমার প্রতি-

শোখের খেলা, আমার ইত-রোগোব অন্ধ • রাগ করোনা তুমি, আমি যে মেয়েমানুষ!'

বললাম, 'ভালবাসলে নাকি?'

ঝড়ের মত হিরন্ময়ী হেসে উঠল,—'ঠিক যা বলেচ, ভালবাসলুম বলেই ত এই পাঁচ বছরে লোকটা সর্ব্বনাস্ত হ'ল,—স্ত্রী, পুত্র, সংসার, সমাজ, কী না ছাড়ল আমার জন্যে। ভুলেই গেলাম সে আমার স্বামী নয়, প্রিয় নয়, প্রিয়তম নয়, ভুলেচ গেলাম আমি কী। দশ বছরে আমার মুখে যে-ছাপ পড়েছিল, সে-ছাপ একটু একটু করে মুছে গেল। বোধ হয় এমনিই হয়, কি বল?'

বললাম, 'পুনর্জ্জন্ম আর কি।'

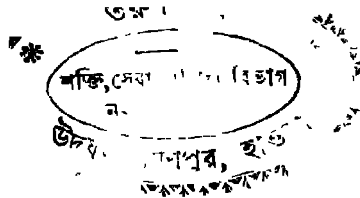
হিরন্ময়ী বললে, 'আজ পাঁচ বছর পরে অবিনাশবাবুর স্ত্রী আমার এখানে এসেছিলেন!'

উঠে বসলাম। বললাম, 'এখানে? মানে, এই বাড়ীতে?'

'হ্যাঁ গো হাঁ, এই ঘরে। কী কান্না আমার পায়ে হাত দিয়ে।'

'এ-বাড়ীতে এল, লোকনিন্দার ভয় নেই?'

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে হিরন্ময়ী বললে, 'লোকনিন্দা? তুমি কী জানো লোকনিন্দার ভয় মেয়েমানুষের মন থেকে কখন চলে যায়? তাকে কাঁদতে দেখে আজ বুঝলাম, কী অন্যায় আমি করেচি এই পাঁচ বছর ধরে।'



'অন্যায় ত করনি, প্রতিশোধ নিয়েচ !'

সে কথা বললে না, ভারাক্রান্ত দুটি আয়ত চোখ জানলার বাইরে জ্যোৎস্না রাত্রির দিকে প্রসারিত করে নিঃশব্দে বসে রইল। রাজপথের কলরব শান্ত হয়ে আসছিল, মাদলের বাজনা থামিয়ে এরই মধ্যে গাড়োয়ানের দল কখন উঠে চলে গেচে। আশপাশের বাড়ীগুলি থেকে হাসি-তামাসা, গান-বাজনা ও কলকণ্ঠের শব্দ ভেসে ভেসে আসছিল।

'ক্ষমা চাইতে এসেছিল, কেমন ?'

'ক্ষমা নয় ভিক্ষে।' হিরন্ময়ী মুখ ফিরিয়ে বললে, 'এসেছিল তার স্বামীকে ভিক্ষে করে নিয়ে যেতে।'

মুখের একটা শব্দ করতেই সে আবার বললে, 'বিদ্রূপ করো না, বুঝলে। জীবনকে সব সময় ঠাট্টা করাটা—' দেখতে দেখতেই হিরন্ময়ীর গলার আওয়াজ ভারি হয়ে উঠল, তার চেহারাটা পর্য্যন্ত যেন বদলে গেল। বললে 'তুমি বুঝবে না মেয়েমানুষের কী হয়। তাদের ভালবাসার মানে তোমাদের ওই প্রেম নয়, সমস্ত পরমায়ুটা। দেহ থেকে হৃদপিণ্ডটা টেনে ছিঁড়ে নিলে কী যন্ত্রণা হয় জানো ? বেঁচে থেকেও মরণ কা'কে বলে বুঝতে শিখেচ ?'

হিরন্ময়ী বিছানাটা ছেড়ে নীচে নেমে গেল, একবার বাইরে গিয়ে বারান্দায় ঘুরে এল, তারপর বললে, 'অথচ আমার কোনো হাত নেই,

আমার প্রেমালাপ সে শুনবে, দিনের পর দিন ধরে মিথ্যে কথা শুনবে, কিন্তু আমার হিতোপদেশ শুনতে চাইবে না।'

আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে লক্ষ্য করে সে হাসতে লাগল, দুটো হাত তুলে মাথার খোঁপাটা একবার ঠিক করে নিল এবং তারপর পুনরায় বললে, 'একরকম গাছের শেকড় আছে জানো, এনে দিতে পারো জোগাড় করে? কিম্বা সেই বনমানুষের হাড়?'

আস্তে আস্তে উঠলাম। সে বললে, 'উঠছ নাকি আজ? ও, টাকার কথা বলছিলে না?' বলে ক্যাশবাক্সটা পেড়ে আঁচলের খুঁট থেকে চাবি নিয়ে খুলতে খুলতে আবার বললে, 'কত টাকা চাই?—শোনো, যদি কোনো তীর্থে যাও, তবে আমার জন্যে একটু প্রসাদ এনো।'

চন্দ্রা, তুমি চেয়ে রয়েছ কেন অমন করে? আর কী শুনতে চাও? কোথাও সামান্য বেদনা, কোথাও-বা ক্ষণিকের আনন্দ, জীবনের চেহারা এমনিই। এমনিই তার বিশৃঙ্খলা, অসামঞ্জস্য—তবু তাকে গ্রহণ করতে হবে পরিপর্ণ প্রীতির সঙ্গে।

-২০